টম সয়্যার অ্যাব্রড

মার্ক টোয়েন



টমস্যয়ার অ্যাব্রড

মার্ক টোয়েন

প্রকাশকাল □ ১৩৯৩

প্রকাশক ॥ রেণুকা সাহা ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর ॥ নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স ॥ ৪/১ই বিডন রো ॥ কলিকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদপট ॥ বিদ্যাঅশোক ॥ অভয়নগর ॥ বেলাননগর ॥ হাওড়া
অলঙ্করণ ॥ রাহুল মজুমদার ॥ ২০/১ নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯
ব্লক ও প্রচ্ছদমুদ্রন ॥ স্পেকট্রাম ॥ ১৭ মনীন্দ্র মিত্র রো ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯
বারো টাকা

যে-সব লেখকের আসল নাম হারিয়ে গেছে তাঁদের ছদ্মনামের বিপুল পরিচিতির আড়ালে, মার্ক টোয়েন তাদের অন্যতম। হ্যাঁ, তাঁর এই মার্ক টোয়েন নামটাও ছদ্মনাম ! তাঁর আসল নাম স্যামুয়েল লংহর্ণ ক্লেমেন্স।

ক্লেমেন্সের জন্ম হয়েছিল উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরে, ১৮৩৫ সালে। কিন্তু জন্মের পরেই তিনি মা-বাবার সাথে চলে আসেন হানিবল শহরে। এখানেই তাঁর শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে।

শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, এই বিশ্ববিখ্যাত লেখক তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একজন স্টীমবোটচালক হিসেবে ! মিসিসিপি নদীতে তিনি নিয়মিত ভাবে স্টীমবোট চালাতেন !

মিসিসিপির ঘাটগুলিতে স্টীমবোটের জোরালো বাঁশি যখনই বেজে উঠতো, তখনই সেখানে দলেদলে ছুটে আসতো ছোটোছোটো ছেলেমেয়েরা। এ-সব ছেলে-মেয়েদের কাছে অতি পরিচিত ছিল স্টীমবোটখালাসীদের 'মার্ক টোয়েন' ধ্বনি। এই ধ্বনি ছিল দীর্ঘ ও সুরেলা, অনেকটা আমাদের দেশের বড় নৌকোর মাঝিদের 'একবাঁও মেলে না দুইবাঁও মেলেনা' ধ্বনির ধরনের। স্টীমার চালানোর জন্ত জলের প্রয়োজনীয় গভীরতার পরিমাপ করা হয় জলের মধ্যে একটা ওজনযুক্ত দড়ির নামিয়ে। দড়ির গায়ে জলের ভেজা দাগ দেখে চীৎকার করে উঠত মাল্লারা 'মার্ক টোয়েন'। পরে এই ডাকটিকেই ক্লেমেনস গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ছদ্মনাম হিসেবে !

মার্ক টোয়েনের সাহিত্যিকজীবন শুরু হয় ১৮৬৬ সালে। তাঁর প্রথম রচনার নাম 'দ্য সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ অব ক্যালাভেরাস কাউন্টি,। প্রকাশকাল ১৮৬৭ সাল। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন ১৮৬৯ সালে তাঁর 'ইনোসেন্টস অ্যাব্রড' গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব টম সয়্যার', 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরি ফিন', 'এ ক্যানেকটিকাট ইয়াঙ্কি অ্যাট দ্য কোর্ট অব কিং আর্থার', 'পারসোনাল রিকালেকশান অব জোয়ান অব আর্ক', 'দ্য প্রিন্স অ্যাণ্ড দ্য পপার' এবং 'টম সয়্যার অ্যাব্রড'।

সারা পৃথিবীর কিশোরদের অতিপ্রিয় এই লেখকের জীবনের অবসান ঘটে ১৯১০ সালে।

চরিত্র-পরিচিতি

টমসয়্যার ঃ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় একটি দুষ্টু কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান ছেলের নাম হচ্ছে টম সয়্যার। মা মারা যাওয়ার পর সে এসেছিল মিসিসিপির তীরবর্তী সেণ্ট পিটার্সবার্গে, তার মাসির বাড়িতে। মাসির নাম আণ্ট পলি। মাসির কাছেই সে পালিত হচ্ছিল।

হাক্ ফিন্ ঃ এই অনাথ ছেলেটি ছিল টমেরই সমবয়সী এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার জীবন-জীবিকা নির্বাহ হতো সেণ্ট পিটার্স বার্গের দয়ালু মানুষদের দয়ায়। পরে যখন সে ওই শহরেরই একটি পড়োবাড়ির গুপ্তধন আবিষ্কার করে তার অর্ধেক ভাগ লাভ করেছিল, তখন থেকে তার জীবনধারায় পরিবর্তন আসে। টমের পীড়াপীড়িতে সে আবার শুরু করে লেখাপড়া।

জিম ঃ এই ছেলেটি জন্মসূত্রে নিগ্রো। টমের মাসির বাড়িতে কাজ করতো সে। তবে সে বিখ্যাত হয়েছিল টমের বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে!

প্রফেসর ঃ ইনি ছিলেন একজন মস্ত বিজ্ঞানী কিন্তু প্রচারবিমুখ। প্রায় গোপনে একটা অদ্ভুত বেলুন জাহাজ তৈরী করেছিলেন, যদিও সেণ্ট লুই শহরের কোন লোকই তার এই অদ্ভুত আবিষ্কারকে মোটেই পাত্তা দেয় নি। ইনি চেয়েছিলেন তার আবিষ্কৃত বেলুনটিতে চড়ে ইওরোপ পাড়ি দিয়ে জগৎবাসীকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে! বেজায় রগচটা মানুষ ছিলেন ইনি। এঁর নিবাস ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট লুই শহরে টমের বাড়ির কাছাকাছি।

কুশল এবং ওর বন্ধুদের

দীপায়ন প্রকাশিত অন্যান্য কিশোর উপন্যাস

মা—ম্যাক্সিম গর্কি

টনি এ্যাণ্ড দি ওয়াণ্ডারফুল ডোর—হাওয়ার্ড ফাস্ট

টল হাণ্টার—হাওয়ার্ড ফাস্ট

রিইউনিয়ান—ফ্রেড উইলমান

স্মোকি—উইল জেমস

বোজ এগেনস্ট দি ব্যারণস্—জিওফ্রে ট্রীজ

টমস্যয়ার অ্যাব্রড

মার্ক টোয়েন

ভাষান্তর / রাধারমণ রায়

দীপায়ন
২০ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০৯

নতুন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে টম

তোমরা কি মনে কর, যে অভিযানটা আমরা সবেমাত্র সেরে এলাম, তাতেই টম সয়্যারের অভিযান করার নেশা একেবারে মিটে গেল? নদীর নাবাল দিকে গিয়ে জিমকে ছাড়িয়ে আনার সময় এবার আমরা বেজায় বিপদে পড়েছিলাম, আর সেই বিপদের মোকাবেলা করতে গিয়েইতো টম পায়ে একটা গুলি খেল— হ্যাঁ, সেই অভিযানটার কথাটাই আমি বলতে চাইছি। এটাই আমরা এই মাত্তর সেরে এলাম। আর সত্যিকথা বলতে কি, এটার পর থেকেই টমকে একেবারে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসেছে! তাইতো ওর এখন চাই আরো অ্যাডভেঞ্চার! একটার পর আরেকটা! বোঝ দিকিনি ব্যাপারটা!

এবার যখন আমরা তিনজন লম্বা নৌকো পাড়িটায় ক্ষ্যামা দিয়ে নদীর উজান বেয়ে গাঁয়ে ফিরলাম, তখন আমাদের নিয়ে গাঁয়ের মানুষের সে কী হৈ-হল্লা! মশাল জ্বালিয়ে, মিছিল করে, নদীর পাড়ে মানুষজন জড়ো হলো আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে! বক্তৃতা, জয়ধ্বনি, চেঁচিয়ে গলা ফাটানো, কোনটাই বাদ রাখলো না তারা! আমরা একেবারে হিরো বনে গেলাম! টম সয়্যার তো সব সময় এটাই চেয়ে এসেছে!

অল্প সময়ের জন্যে হলেও টমের মন আনন্দে ভরে উঠল। অভ্যর্থনায় কে না আনন্দ পায়। টম এমন ভাবে গটগট করে গ্রামখানা চক্কর মারতে লাগলো, যেন এখানকার জমিদারিটাই কিনে ফেলেছে ও! কেউ কেউ ওকে 'পর্যটক টম সয়্যার' বলেও অভিহিত করলো, এতে ওর বুক আরো ফুলে উঠল!

একটা কথা অবশ্য মানতেই হবে, এই অ্যাডভেঞ্চারটায় আমার আর জিমের ওপর টেক্কা দিয়েছে টম। কেন না, আমরা দুজনে নদীর নাবালে পাড়ি দিয়েছিলাম ভেলায় চেপে, আর উজানে উঠে এসেছিলাম স্টীমবোটে চড়ে। আর টম নামা-ওঠার দুটো পর্বই সমাধা করেছিল স্টীমবোটে অর্থাৎ কলের নৌকোয় চড়ে।

আমাদের এই অভিযান ব্যাপারটা গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার কাছে খুব জব্বর মনে হলেও বুড়ো ন্যাট পারুজনস কিন্তু এটাকে বাঁকা চোখে দেখেছিলেন!

ন্যাট হচ্ছেন এ-গাঁয়ের পোস্টমাস্টার। লম্বা-মজবুত পাকানো চেহারা তাঁর। বয়েস বাড়ার সঙ্গে মাথায় পড়েছে চুকচুকে টাক। সত্যিকথা বলতে কি, তাঁর মত বক্তিয়ার খিলজি লোক আমি ভূ-ভারতে দেখিনি! প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনিই কেবল পর্যটক হিসাবে এ-গাঁয়ে খ্যাতি পেয়ে আসছিলেন। এই তিরিশ বছর তিনি যে কত লোককে তাঁর পযটনের গপ্প শুনিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ

করেছেন, সে-হিসাব আমার জানা নেই। কাজেই যে-ছেলেটার বয়েস এখনো পুরো পনেরো হয় নি, তাকে সবাই তোয়াজ করবে, তাকে মাথায় নিয়ে দিনরাত নাচানাচি করবে, এটা যে তাঁর পছন্দ হবে না, তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। বরং বলা চলে, টমের মতন একটা বাচ্চা ছেলে তাঁর এত কালের সুনামের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠাতে মনের মধ্যে তীব্র জলুনি নিশ্চয়ই তিনি অনুভব করছিলেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী পর্যটক সুনামের অধিকারীর কাছে একটা পুঁচকে এচোঁড়ে পক্ক প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব-সংবাদটাই তো মস্ত বড়ো একটা শেল বিশেষ!

মহামহিম হ্যাট পার্জনসের প্রথম পর্যটন যখন তিনি এ-গাঁয়ে পোস্ট-মাস্টারের চাকরি পেলেন। আর এই চাকরিতে যখন তিনি নিতান্তই নবীন সে-সময়ে এমন একজনের নামে একটা চিঠি এলো, যে-নামে এ-গাঁয়ে তখন কোন লোকই ছিল না। আসলে সেটা ছিল একটা উড়োচিঠি। কিন্তু এই উড়োচিঠিটাই শেষ পর্যন্ত হ্যাটের চাকরি-টিকে খতম করতে চাইল! তাঁর দপ্তরে চিঠিটা পড়ে রইলো, কিন্তু তাঁর মাথায় ঢুকলো মহাচিন্তা। চিন্তা করতে করতে যন্ত্রনা শুরু হল তাঁর মাথায়, মাথার যন্ত্রনার আরো একটা কারণ ছিল—সেটা হচ্ছে ডাক বিভাগের পাওনা। কেন না, চিঠিটার ওপর কোনো ডাকটিকিট সাঁটা ছিল না, কাজেই ডাক বিভাগের পাওনা হয়েছিল দশ সেণ্ট। এই সরকারী পাওনা আদায়ের কোনো উপায়ই দেখতে পেলেন না তিনি! তাঁর মনে হলো, তিনি যদি এই পাওনা আদায় করতে না পারেন, তাহলে সরকার তাঁকে এরজন্য দায়ি করবেন, আর তাঁর চাকরিটাও তখন ঘচাং করে চলে যাবে! এই চিন্তাতে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর চোখের ঘুম চলে গেল, পেটের খিদে মরে গেল, শরীর শুকিয়ে চিমসেপানা হয়ে গেল, চোখ ঢুকে গেল গর্ত্তে। এই গোলমেলে ব্যাপারে কারোর পরামর্শ নিতে গেলে পরামর্শদাতা পাছে সরকারকে খবরটা গোপনে জানিয়ে দেয়, এই ভয়ে তিনি কারোর পরামর্শও নিতে পারলেন না! মাথা খাটিয়ে তিনি একদিন গভীর রাতে উড়োচিঠিটা ঘরের মেঝেয় পুঁতে ফেললেন। কিন্তু শান্তি পেলেন না এতেও। কেউ যদি দেখে ফেলে বা জেনে থাকে তো একেবারে সাড়ে সর্ব্বনাশ! কাজেই ঠিক করলেন, রাতের অন্ধকারে চিঠিটা মেঝে থেকে তুলে অন্য কোথাও পাচার করবেন! তাঁর চালচলন, কথাবার্তা এ-সময়ে এতই সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিল, যে গাঁয়ের লোকেরা ধরেই নিয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই কোনো খুনটুন কিংবা কোনো একটা মারাত্মক অপকর্ম করে ফেলেছেন! গাঁয়ের লোকেরাও তখন থেকে তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলো।

অবশেষে ভদ্রলোক ঠিক করলেন, ওয়াশিংটনে গিয়ে খোদ রাষ্ট্রপতির গোচরে আনবেন বিষয়টা। তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বলে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবেন তিনি। মনে মনে এটা ঠিক করেই তিনি একদিন ভোরে রাজধানীর পথে যাত্রা করলেন। কিছুটা পথ ডাকগাড়িতে, কিছুটা পথ নৌকোয় আর বাকি পথটা ঘোড়ার পিঠে চেপে হ্যাট পার্‌জনস্‌ হাজির হলেন ওয়াশিংটনে। এতে তাঁর সময় লাগলো প্রায় তিন হপ্তা। পথে তাঁর চোখে পড়লো অনেক প্রদেশ, অজানা গাঁ আর চার-চারটে শহর। প্রায় আট হপ্তা পরে তিনি যখন আবার এ-গাঁয়ে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মতন এমন দীর্ঘ পর্যটনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গর্বিত লোক নাকি এ-তল্লাটে আর একজনও ছিল না! বহু দূর দূর জায়গা থেকেও মানুষজন আসতে লাগলো তাঁর কাছে, তাঁর রাজধানী-অভিযানের গল্প শুনতে কিংবা শুধু একবার তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখে যেতে! সুতরাং টমের এই দীর্ঘ রোমাঞ্চকর অভিযানের বিবরণ শোনার পর এটা এখন সবার পক্ষেই স্থির করা কঠিন হয়ে পড়লো, হ্যাট আর টমের মধ্যে কে বড়ো পর্যটক। কেউ কেউ বললো হ্যাট বড়ো, কেউ কেউ বললো নাহে টম বড়ো। দ্রাঘিমাংশের বিচারে হ্যাট বড়ো, কিন্তু অক্ষাংশ ধরলে টম বড়ো। তখন এই সমস্যা দূর করার জন্যে একটা সূত্র বের করা হলো। পর্যটন যাত্রার মধ্যে বিপজ্জনক ঘটনাকে ধরা হলো শ্রেষ্ঠত্ব মাপার মাপকাঠি। অভিযানের সময় যে যত বড়ো বিপদের মধ্যে পড়েছিল, সে-ই হচ্ছে তত বড়ো মাপের পর্যটক!

টমের পায়ের সেই বিশ্রী ক্ষতটা, যেটা সে উপহার পেয়েছিল শত্রুদের কাছ থেকে, সেটা যে এ-সময় এমন উপকারে লাগবে, তা টম স্বপ্নেও আগে বুঝতে পারেনি, আমিও পারি নি! সেই ক্ষতটাই এখন বুড়ো হ্যাটের বুকে বিষম ধাক্কা মারলো, সৃষ্টি করলো এমন একটা বিচ্ছিরি চেহারার মানসিক ক্ষত, যেটার উপশমের জন্যে তিনি একের পর এক কথার ফুলঝুরির মলম লাগিয়ে চললেন! শেষকালে সেই কথাগুলো জমতে জমতে ক্রমশ একটা মালার রূপ নিল, যাকে গেঁয়ো ভাষায় বলা হয় খাজুরে গপ্প। গপ্পটার কতটুকু অংশ সত্যি, তা আমি বলতে পারবো না। তিনি ওগুলো খবরের কাগজ থেকেও জোগাড় করে থাকতে পারেন কিংবা অন্য কোনোখান থেকেও পেয়ে থাকতে পারেন! তাঁর গপ্পটা অনেকটা এই রকমের—

ওয়াশিংটনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমেই হ্যাট পার্‌জনস জানতে পারলেন, রাষ্ট্রপতি ফিলাডেলফিয়া যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর সাথে দেখা করতে হলে আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করা চলবে না। হ্যাট তখন বেজায় মুষড়ে

পড়লেন। কেন না, ঘোড়াটা তিনি ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাহলে উপায় ? এমন সময় হ্যাট চোখে দেখতে পেলেন এক মূর্তিমান উপায়কে। পুরোনো একটা নড়বড়ে ছ্যাকড়া গাড়িকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ 'এদিকপানেই চালিয়ে নিয়ে আসছে !

কৃষ্ণাঙ্গ গাড়োয়ানটার কাছে ছুটে গিয়ে হ্যাট বলে উঠলেন, 'আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে যদি পরিষদভবনে (তার মানে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভবনে) পৌঁছে দিতে পার, তোমাকে আধ ডলার ভাড়া দেব। আর যদি কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিতে পার, তাহলে ভাড়ার ওপর সিকি ডলার বেশী বকশিস পাবে।'

কৃষ্ণাঙ্গ গাড়োয়ানটা বললো, 'এ আর এমনকি ব্যাপার কর্তা, উঠে পড়ুন তাহলে !'

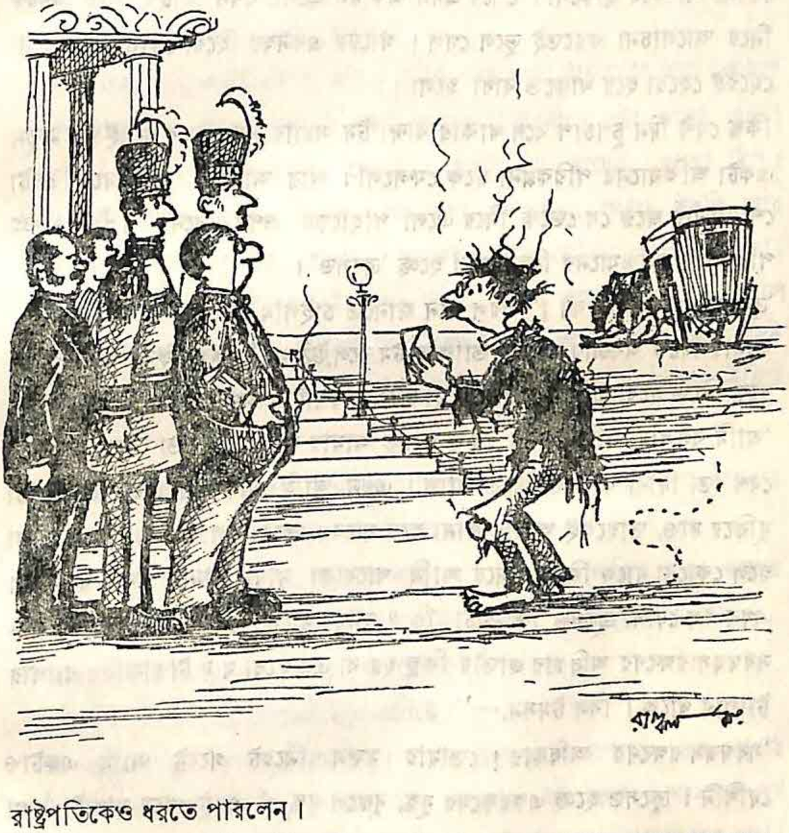
গাড়ির ভেতর একলাফে উঠে পড়েই হ্যাট পার্বজনস দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিলেন।

রাস্তাটা ছিল ভীষণ খারাপ, এবড়ো খেবড়ো। তার ওপর দিয়ে নড়বড়ে গাড়িটা যখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে সশব্দে ছুটতে লাগলো, তখন হ্যাটের প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। তিনি লুপের (তার মানে, গাড়ীর ভেতরে ধরে থাকার দড়ি) মধ্যে দুহাত ঢুকিয়ে দিয়ে কোনো রকমে ঝুলে প্রাণ বাঁচাতে লাগলেন। একটু বাদেই গাড়িটা ধাক্কা খেল পথের মাঝে উঁচু হয়ে থাকা একটা পাথরের সাথে। বোধ হয় একেই বলে গোদের ওপর বিষফোড়া। ধাক্কা খেয়েই গাড়িটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো শূন্যে ! গাড়িটা নীচের অংশটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে ! হ্যাট ঝুলে পড়লেন নীচে, প্রায় যেয়ে পড়লেন মাটির ওপর ! পরিস্থিতিটা ছিল তাঁর পক্ষে তখন যাচ্ছেতাই রকমের বিশ্রী !

হ্যাট কিন্তু সাহস হারালেন না বা দমলেন না মোটেই, শক্ত হাতে লুপ ধরে পা দুটোকে উঁচু করে ঝুলে রইলেন তিনি। গাড়োয়ানকে গাড়িটা থামাতে বললেন চিৎকার করে। এই ব্যাপার দেখে পথচলতি লোকেরাও চেঁচাতে লাগলো। হ্যাটের অবস্থা সে সময় অনেকটা ফাঁসির আসামীর মতন ! তাঁর মাথা আর কাঁধটা বেরিয়ে এসেছে জানালা দিয়ে !

চেঁচানিতে ফল ফললো উল্টো। গাড়োয়ান ভাবলো হ্যাট বোধহয় তাকে গাড়িটা আরো জোরে ছোটাতে বলছেন, আর সে তা শুনতে পাচ্ছে না ভেবে জনতা চেঁচিয়ে তাকে আরো জোরে যেতে বলছে। কাজেই সে ঘোড়াদুটোকে আচ্ছা করে চাবকাতে চাবকাতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'কর্তা, মোটেই ঘাবরাবেন না, আমি ঠিক সময়ে আপনাকে পরিষদ ভবনে পৌঁছে দেব।' ভাড়া গাড়িটা

আশ্চর্যজনক ভাবে শেষ পর্যন্ত সত্যিই সত্যিই ঠিক সময়ে পৌছে গেল পরিষদভবনে। লোক বলাবলি করতে লাগলো, এর আগে নাকি এত জোরে ওরা কাউকেই কখনো ছ্যাকরা গাড়িকে ছোটাতে দেখেনি।
গাড়িটা থামার সাথে সাথে ঘোড়াদুটো চার-পা ছেড়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে। হ্যাটও ধরাশায়ী, তাঁর সারা গায়ে ধুলো ভর্তি। জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাই। জুতোজোড়া ঠোক্কর খেয়ে খুলে পড়ে গেছে পথের মাঝে। তবে তাঁর সান্তনা এই, তিনি ঠিক সময়ে পরিষদভবনে পৌছতে পেরেছেন। তাই তো তিনি



রাষ্ট্রপতিকেও ধরতে পারলেন।
স্বয়ং রাষ্ট্রপতির হাতে ঐ চিঠিটা দিয়ে হ্যাট তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। রাষ্ট্রপতি তক্ষুনি তাঁকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিলেন। হ্যাট খুশিতে ডগমগ হয়ে গাড়োয়ানকে চুক্তি অনুযায়ী ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ভাড়ার ওপর বখসিস দিলেন একসিকির জায়গায় দু-সিকি!
হ্যাটের এই উদ্দাম অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের প্রভাব গাঁএর লোকজনের উপর

নিঃসন্দেহে খুবই জোরালো হয়েছিল। সুতরাং এটাকে একডিগ্রী টপকানোর জন্যে টমকে ওর পায়ের ক্ষতচিহ্নটাকে প্রকট করে দেখাতে হয়েছিল !

তবে টমের গৌরবও দিনে দিনে ম্লান হয়ে আসতে লাগলো। অবিশ্যি কতকগুলো বিদঘুটে হুজুগই হচ্ছে এরজন্যে দায়ি। প্রথমে এলো ঘোড়াদৌড়ের হুজুগ ! তারপর এটাকে টেক্কা দিল মস্ত একটা বাড়ি, যেটা আগুনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল ! এরও ওপরে এসে গেল একটা সার্কাস ! সেই সার্কাসকে টেক্কা দিল সূর্য গ্রহণ ! এ-ভাবে একটার পর একটা সাড়াজাগানো হুজুগ এসে টমের গৌরবকে কোনঠাসা করে ছাড়লো। শেষে এমন একদিন এলো, যখন মানুষ আর টমকে নিয়ে আলোচনা করতেই ভুলে গেল ! গাঁয়ের একনম্বর হিরো কোন কিছুতে না হেরেই হেরো হয়ে থাকতে বাধ্য হলো !

কিন্তু বেশী দিন চুপচাপ বসে থাকার বান্দা টম সয়্যার নয়। বসে বসেই সে নতুন একটা অভিযানের পরিকল্পনা ছকে ফেললো। আর আমাকে ও জিমকে সেটা শোনানোর জন্যে সে ডেকে নিয়ে এলো পাহাড়ের ওপর, বনের গভীরে। ওর পরিকল্পিত অভিযানের বিষয়বস্তুটা হচ্ছে 'ক্রুসেড'।

'ক্রুসেড' সে আবার কী ?' সরল মনে জানতে চাইলাম আমি।

আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে টম বলে,উঠলে, 'হাক্‌ল ফিন্, আমাকে কি বুঝে নিতে হবে, তুমি বলতে চাইছো ক্রুসেড কথাটায় অর্থ তোমার জানা নেই ?'

'আমি বললাম, সত্যিই না। কিন্তু তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি তো কিচ্ছু হয় নি। বেশ তো দিব্যি বহালতবিয়তে আছি। এখন আমি যদি আমাকে ওর অর্থটা বুঝিয়ে দাও, তাহলেই আমার জানা হয়ে যাবে। তবে বলে রাখি, দরকার না হলে কোনো বাজে জিনিস নিয়ে আমি খামোকা মাথা ঘামাই নে। যাক গে এখন বল দেখি, ক্রুসেড জিনিষটা কি ? তার আগে বলে নিই, এটাতে যদি সর্বস্বত্বসংরক্ষণের অধিকার জাতীয় কিছু হয় বা এর মধ্যে যদি টাকাকড়ির ব্যাপার ট্যাপার থাকে। বিল টমসন,—'

'সর্বস্বত্বসংরক্ষণের অধিকার ! তোমার মতন নিরেট গবেট আমি একটাও দেখিনি। ক্রুসেড হচ্ছে একরকমের যুদ্ধ, বুঝলে বুদ্ধু।' একটু থেমে মাথাটা ঠাণ্ডা করে ও আবার বললো, 'পবিত্র দেশ উদ্ধার করার জন্য যে ধর্ম যুদ্ধ, তাকেই বলে ক্রুসেড।'

'পবিত্র দেশ, তুমি কোন্‌টাকে বলছো ?' আমি শুধোলাম।

'পবিত্র দেশ জগতে শুধু একটা মাত্রই আছে।'

'সেটা খামকা উদ্ধার করার দরকারটা কী ?'

'বুঝিয়ে বলছি, পবিত্র দেশটা এখন রয়েছে বিধর্মীদের হাতে। তাদের হাত থেকে সেটা উদ্ধার করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য।'

'সেটা তাদের হাতে কবে এবং কিভাবে গেল ?'

'যায় নি বুঝলে, ওটা আগে থেকেই ছিল।'

'তাহলে টম, দেখা যাচ্ছে দেশটা তো তাদেরই। তাই না ?'

'তাদেরই তো। কে অস্বীকার করছে যে তাদের নয় ?'

আমি ওর কথার সুরটা ধরতে না পেরে বলে উঠলাম, 'টম সয়্যার আমার যদি একটা খামার থাকতো, সেটা যদি অন্য কোনো লোক দখল করতে চাইতো, তাহলে কি তার চাওয়াটা ন্যায্য হতো ?'

'হাক্ল ফিন, তুমি একটা বোকা রাম। বৃষ্টির সময় মাথা বাঁচানোর কথা তোমার মাথায় আসে না। ক্রুসেড মোটেই একটা খামার বাড়ি নয়। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা ব্যাপার। বুঝিয়ে বলছি, শোনো। দেশটা যে তাদের, একথা ঠিক। কিন্তু সেটা পবিত্র করলো কারা ? আমাদের লোকেরা, অর্থাৎ ইহুদি আর খ্রীস্টানরা সেটাকে পবিত্র করেছে। কাজেই এখন সেটাকে অপবিত্র করার অধিকার বিধর্মীদের নেই এবং এটা এখন আমরা সহ্য করবো না। তা করলে বিষম লজ্জার ব্যাপার হবে। কাজেই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সেই পবিত্র দেশটা তাদের হাত থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে এখন আমাদের উচিত কাজ।'

'ব্যাপারটা বেজায় গোলমেলে। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ধর, আমার যদি একটা খামার থাকতো, আর অন্য একটা লোক যদি—।'

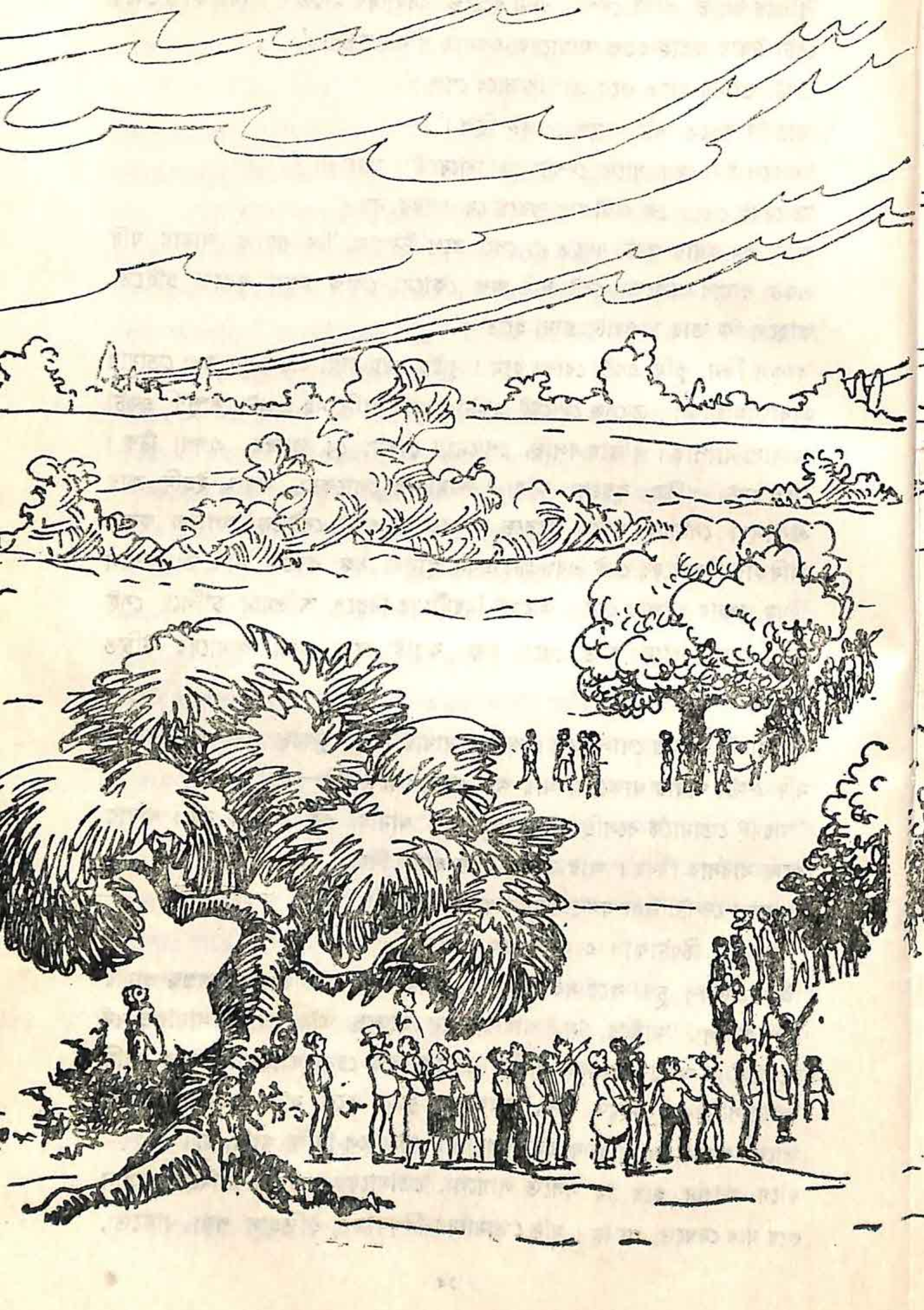
'আগেই তোমাকে বলেছি না, ক্রুসেড আর খামার এক জিনিস নয়। খামার হচ্ছে ব্যবসার বিষয়। আর ক্রুসেড হচ্ছে ধর্মের বিষয়। দুটো দুরকম।'

'অন্যদের দেশটা জবর দখল করাটা ধর্মের বিষয় !'

'নিশ্চয়ই। চিরটাকাল এরকমই হয়ে এসেছে।'

জিম এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার মাথা নেড়ে হাস্যকর অশুদ্ধ ভাষায় বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, আমার মনে হতেছে এটা ভুল। আমারও ধর্ম রয়েছেন। আমার অনেক ধার্মিক লোকেদেরও চেনা আছেন। কিন্তুক আমি একটা সত্যিকথা কইতে চাই, ধম্মকম্মের ধুয়ো তুলে যারা ওরকম করবেন, তাদের কখনো আমি হাঁ করতে পারবুনি। এটা বুলে দিচ্ছি আমি, হাঁ।'

রাগে আগুন হয়ে টম বলতে লাগলো, 'তোমাদের অজ্ঞতায় আমিতো অজ্ঞান হয়ে যাব দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমাদের বিন্দুমাত্রও ইতিহাস পড়া থাকতো,





তাহলে জানতে পারতে রিচার্ড কার দ্য লুন, পোপ, গডফ্রে দ্য বুলেন প্রভৃতি বহু মহান্ ধার্মিক ব্যক্তি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে দুশো বছর ধরে অভিযান চালিয়ে আসছেন, বিধর্মীদের হাত থেকে পবিত্র দেশটা উদ্ধার করার করার জন্যে। তাঁরা সবাই রক্তের মধ্যে সাঁতার কেটেছেন। দুনিয়ার সবাই এটা জানে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের এই মিসৌরীর দুটো জংলী কিম্ভুত, তারা এর কিছুই জানে না! অথচ তারা এখন ক্রুসেডের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন তুল্ছে!'

টমের কথায় আমার মুখটা বন্ধ হয়ে গেলেও জিমের তা হলো না। হাস্যকর ভাষায় সে বলে উঠলো, 'ঠিক কথা, ধরেই নিতেছি যারা জানে তারাই সব ঠিক, আর আমরা নিয্যশ বেঠিক। যদি কিচ্ছুটি না জেনেই থাকি, তাহলে আমাদের এখন কি কাজ করত্তি হবে, না তোমাদের সাথে যেয়ে যোগ দিতি হবে। এই তো? তাহলি এখন আমার সেই বিধর্মীদের জন্যি যতটা দুঃখু না হতেছে তার চেয়ে বেশী দুঃখু হতেছেন মাস্টার টমের জন্যে। হায় ভগমান, যেসব নোকেদের আমাদের চেনা নাই, যারা আমাদের কোনো কুটোটি ভাঙ্গেনি, আমাদের এখন সেই সব নোকজনদের খতম করতি যাতি হবে! আবার দেখো যদি আমরা সেখানে যাই, তাহলি আমাদের লিশ্চয় খিদে নাকবে, ঘুম পাবে, তখন আবার তাদেরই কাছে আমাদের খাবার ভিক্ষে করতে যাতি হবে। তার চেয়ে—।'

'অ্যাঁ, কী বলতে চাইছিস তুই?'

'বলতে চাইতেছি কি ক্রুসেড না গিয়ে এক কাজ করলি হয় না, আজ রাত্তিরে যখন চাঁদ ডুবি যাবে, তখন তুমি, হাক্ আর আমি এই তিন জনে মিলে দু-একটা কুড়োল কাঁধে নিয়ে, নৌকো চেপে নদীতে বেরিয়ে পড়ি চল। ওপারে স্নাইয়ে যেয়ে সেই গরীব পরিবারটাকে কুড়োলের কোপ মেরে শেষ করে তাদের বাড়িটায় আগুন ধইরে দিয়ে আসি।'

'আহ্, ব্যাটা থাম।' ধমকে উঠলো টম। তারপর বিরক্তির সাথে বললো, 'তোর আর হাক্ ফিনের মতন যারা মাথামোটা, যারা মূল বিষয় থেকে সব সময় দূরে সরে যায়, তাদের সাথে তর্ক করা বৃথা। কিসস্যু বোঝো না, খালি এঁড়ে তক্ক! কথা হচ্ছে একটা পবিত্র বিষয় নিয়ে, কিছুর মধ্যে কিছু নয় তার মধ্যে নিয়ে এলে কতকগুলো অপবিত্র বস্তু!'

টমের যুক্তি আমি মানতে পারলাম না। জিমও খারাপ কথা কিছু বলেনি, আমিও খারাপ কিছু বলিনি। আমরা স্বীকার করি, আমাদের চেয়ে টম অনেক কিছুই বেশী জানে, বুদ্ধিমান। কিন্তু ক্রুসেডের ব্যাপারটা আমাদের ও যা বললো, সেটা আমাদের মাথায় ঢুকল না। আমরা দুজন অজ্ঞ বলেই হয়তো ব্যাপারটা আমাদের

মাথায় ঢুকলো না। তবুও বলবো, ধর্মের নামে যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে মস্ত বড়ো একটা অধর্ম! কিন্তু টম আমাদের কথা শুনতেই চায় না। ও বলতে চাইছে, আমরা যদি ওর কথায় সায় দিতাম, হাজার তুয়েক বর্মপরা বীর সৈনিককে ও ঠিক জোগাড় করে নিত। তারপর আমাকে আর জিমকে সহকারী সেনাপতি করে ও নিজে হতো প্রধান সেনাপতি। তারপর সমুদ্র পেরিয়ে অভিযান করে সমস্ত বিধর্মীদের ঝেঁটিয়ে সমুদ্দ্রে ফেলে দেওয়া যেত। ফলে পবিত্র দেশটাও তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেত। তারপর আমরা যখন অভিযান শেষ করে দেশে ফিরে আসতাম, আমাদের গৌরবের রঙ সূর্যাস্তের রঙের মতনই রাঙা হয়ে উঠতো! কিন্তু আমাদের সুবর্ণ সুযোগ দেওয়া সত্বেও আমরা তা বোকামীর জন্য গ্রহণ করলাম না, এ সুযোগ ও আমাদের আর কখনো দেবে না। আর তা দেয়ও নি! একবার ও না বললে ওকে তুমি কিছুতেই হ্যাঁ বলাতে পারবে না। কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি হচ্ছি শান্তিপ্রিয় মানুষ যারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি, যাদের আমি চিনি না, তাদের ক্ষতি করার কথা আমি কখনও ভাবিনি। বিধর্মীরা শান্তিতে থাকুক, আমরাও শান্তিতে থাকি। এই ভালো। মনে হয় ক্রুসেড সম্বন্ধে টমের এই যে-ধারনা, সেটা ও আসলে পেয়েছে ওয়ালটার স্কটের বই থেকে। ধারনাটা বর্বর। আমি মনে করি, জনসাধারণের কাছ থেকে এতে কখনো ভাল সাড়া পাওয়া যাবে না। কাজেই ও যা চাইছে, তা ও কখনো করতেও পারবে না। আমিও স্কটের বইগুলো পড়ে দেখেছি, সেগুলো পড়ে আমি যা বুঝেছি তা হল বেশীর ভাগ মানুষ যদি চাষবাস, কাজ কর্ম ছেড়ে ক্রুসেড করতে যায় তাহলে তুঃসময় আসতে বেশী দেরি হবে না।

বেলুনে আরোহন

টম অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে একেবারে উঠেপড়ে লাগলো। একটার পর একটা অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয়েই বেরোতে লাগলো একটা না একটা বিচ্ছিরি রকমের খুঁত। সেগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে ও এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছোলো, যার নাম হতাশা। সত্যিই বেজায় হতাশ হয়ে পড়লো ও। ভীষণ ভাবে!

এ-সময় সেণ্ট লুই শহরের কাগজগুলো একটা বেলুন সম্বন্ধে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন সব খবরাখবর ছাপাচ্ছিল, যা পড়ে লোকের মনে হচ্ছিল, বেলুনটা বুঝি আকাশে ওড়ার আগেই সাংবাদিকদের কলমের গুঁতোয় এক লাফে পৌছে যাবে

ইওরোপে !

টম একবার বেলুনটাকে দেখতে যাবে বলে ভাবলো, তবে মনটাকে স্থির করতে পারছিল না অথচ কাগজগুলোর গরমাগরম খবর ওকে ক্রমশই অস্থির করে তুলতে লাগলো। ভাবলো, যদি বেলুনটাকে একবার স্বচক্ষে না দেখে আসে, অভিজ্ঞতালাভের একটা মস্ত সুযোগ হারাবে ও। তার ওপর দেখলো, হ্যাট পারজনসও গুটি গুটি বেলুনটাকে দেখতে যাচ্ছে। কাজেই ওকেও যেতেই হবে! যদি এখন ও না যায়, হ্যাট ফিরে এসে বুক ফুলিয়ে বেলুন সম্বন্ধে একটা ফাঁপানো গল্প ছেড়ে বসবেন, তখন যেটা চুপচাপ হজম করে যেতে হবে ওকে। নাহ্, টমের কাছে এ একেবারেই অসহ্য! অতএব টমের সাথে আমাকে আর জিমকেও বেলুন দেখতে বেরিয়ে পড়তে হলো। সোজা চললুম বেলুনটার কাছে। বেলুনটা বিশাল বড়ো। তবে ছবিতে যেরকমটি দেখা যায় সেরকম এটা দেখতে নয়। কেমন যেন অদ্ভুত দেখতে। টুয়েলফথ্ স্ট্রিটের বর্ণারে, শহরের একদম শেষ প্রান্তে যে খোলামেলা জায়গাটা আছে, বেলুনটা সেখানেই বাঁধা রয়েছে। বিশাল এক জনতা বেলুনটাকে ঘিরে রয়েছে। তারা বেলুনটাকে দেখছে আর বিচ্ছিরি ভাবে চেল্লাচ্ছে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। রোগা-ফ্যাকাসে মত একটা মানুষকে তারা টিটকিরি দিচ্ছে এই বলে, যে বেলুনটাকে তিনি নাকি কখনই ওড়াতে পারবেন না! ওড়ালেই ওটা পট করে পড়ে যেয়ে ফট করে পটকার মত ফেটে যাবে।

টিটকিরি শুনে শুনে মানুষটা বেজায় ক্ষেপে গেলেন, জনতার দিকে ফিরে ঘুঁসি পাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলতে লাগলেন তিনি, 'এই জনসাধারণ হচ্ছে পশুদের মতন বোকা, আর অজ্ঞতায় অন্ধ। তবে এমন একটা দিন সমুখেই আসছে যখন তারা দেখতে পাবে জাতির মর্যাদাকে আমিই উঁচুতেতুলে ধরেছি। সভ্যতাকেও কয়েক-ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছি। ভবিষ্যতে তোমাদের নাতিপুতিরাই ঠিক এই জায়গাটাতে আজকের এই ঘৃণিত মানুষটার স্মৃতিস্তম্ভ তুলবে, মহাসমারোহে যেটা টিকে থাকবে হাজার বছর! আর এই মানুষটার নামটাও সেই সাথে টিকে থাকবে লক্ষকোটি বছর!'

মানুষটার কথা শেষ হতেই জনতা বেদম হাসিতে ফেটে পড়লো। তারা বিদ্রূপ করে মানুষটার কাছে জানতে চাইলো,—মশাই আপনার বিয়ের আগেকার নামটা কি? এই সঙ্গে কেউ কেউ জানতে চাইলো, তাঁর বোনের বিড়ালের ঠাকুমার নাম। এইভাবে তারা সমানে মানুষটার পেছনে লেগে তার হাড়মাস জ্বালাতে শুরু করলো।

জনতার ভাষায় মজাদার কৌতুকরসের ছোঁয়া আর বুদ্ধির কিছু ছাপ থাকলেও তাতে না ছিল কোন ভব্যতা, না ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক কিছু। মানুষটাকে তারা একেবারে মুখই খুলতে দিল না! একনাগাড়ে বেপরোয়া টিটকিরির বন্যা বইয়ে দিল তারা।

মানুষটা হচ্ছেন একজন অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক। কাজেই তিনি মেঠো জনতাকে তোয়াক্কা করবেনই বা কেন? অধ্যাপকেরা সবসময়ই মনে করেন, তাঁরা বিশেষ একটা বিষয় সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন। তাই সে-বিষয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের পরামর্শ উপদেশ নেবার প্রয়োজনই বোধ করেন না। কোনো পরামর্শের ধারই ধারেন না। এরই ফলে সাধারণ মানুষও তাঁদের এড়িয়ে চলে, বুঝতে না পেরে অবজ্ঞা করে। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এটা। এই বিজ্ঞানীরা, মনীষীরা যদি বিনয়ী হতেন, ধৈর্য ধরে সাধারণ মানুষের কথা শুনতেন, তাদের সবকিছু বোঝাবার চেষ্টা করতেন এবং বোঝাতেন তাহলে তাঁদের ভালই হতো। সাধারণ মানুষ তাহলে তাঁদের এমন করে পেছনে লাগতো না।

নীচের কাজকর্ম সেরে এবার তিনি সিঁড়ি বেয়ে বেলুনযানটার উপরে উঠে গেলেন—বেলুন যানটার প্রযুক্তিবিদও এই অধ্যাপক। তিনি বেলুনযানটার যে-অংশে উঠলেন সেটা অনেকটা দেখতে বিরাট একটা নৌকোর মতন। সিড়ি বেয়ে আমরা অধ্যাপকের পেছন পেছন এবার বেলুনের সাথে ঝোলানো নৌকোটার ওপরে উঠে পড়েছি। লোকগুলো ঘুরছে, ফিরছে, দেখছে। হ্যাট পারজনসকেও এই কুড়ি জনের মধ্যে দেখা পেল। নৌকোটা বেশ লম্বাটে ও অনেকটা চওড়া। তার ভেতরে চারদিকে অনেকগুলো খোপ খোপ বাক্স। সেগুলো মনে হলো এমন ভাবে তৈরী যাতে জল পর্যন্ত ঢোকার জো নেই। সেগুলোর মধ্যে নানা রকমের দরকারি জিনিসপত্তর বোঝাই। বাক্সগুলো এত বড়ো বড়ো যে একটা মানুষ তার ওপর শুতে বসতেও পারে।

প্রফেসর চেঁচিয়ে উঠলেন। সবাইকে দ্রুত নেমে পড়তে বললেন, বেলুনটাকে তিনি এবার ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। লোকগুলো হুড়মুড় করে একসাথে বেলুন থেকে নামতে শুরু করলো। হ্যাট পারজনসকেও দেখলাম এক পাশে দাঁড়িয়ে, মতলব—সব শেষে নামবেন। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই আমাদের শেষে নামতে দেওয়া যায় না। তিনি না নামা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই নড়ছি নে। আমরা তিনজনই নামবো সবার শেষে, অন্তত: হ্যাট পারজনসের পরে। প্রফেসরের আর এক হুঙ্কারে হ্যাট নেমে পড়লেন। এবার নামার পালা আমাদের। এমন সময় একটা বিকট আওয়াজটা কানে যেতেই তাকিয়ে দেখলাম, শহরটা যেন একটা

গুলি খেয়ে আমাদের নীচে পড়ে যাচ্ছে ! ভয়ে আমি বোবা হয়ে গেলাম ! একি কাণ্ডরে বাবা, জিম যেন বুড়ো হয়ে গেল। ওরও মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছো না। আর টম ? ও কথা বললো না বটে, তবে ওকে বেজায় উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। শহরটা আরো—আরো—আরো নীচে নামতে লাগলো। আমরা চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম বেলুনের নৌকোয়, আর এ-ভাবেই আমরা ঝুলে রইলাম শূন্যে। কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি !

চোখের সামনেই শহরের বাড়িগুলো ক্রমশ ছোট হতে লাগলো। মানুষ আর বাড়িগুলোকে মনে হতে লাগলো ছারপোকা আর পিঁপড়ের মতন ছোটো। রাস্তাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন সুতো। তারপরেই সবকিছু হয়ে গেল একাকার ! চোখ বড় বড় করে আমরা চেয়ে রইলুম নীচের দিকে।

শহরটা আর শহর রইলো না। সেটাকে মনে হতে লাগলো পৃথিবীর একটা ক্ষতচিহ্ন বলে ! উজান আর নাবাল দিক মিলিয়ে মিসিসিপি নদীটার প্রায় হাজার মাইল দৈর্ঘ্য আমি দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য হিসেবে খানিকটা গরমিল থাকলেও থাকতে পারে।

ধীরে ধীরে পৃথিবীটা হয়ে গেল যেন বিশাল বলের একটা দিক ! নানা রঙের অবিকল একটা বিরাট গোলকের কিছুটা অংশ দেখতে পাচ্ছি আমি ! নদীগুলো যেন সেই বল বা গোলকের ওপর কয়েকটা দাগ মাত্র !

ওয়াইডার ডগলাস আমাকে সব সময় বলতেন, পৃথিবীটা একটা বলের মতন গোল। কিন্তু আমার চোখে পৃথিবীটা দেখতে ছিল একটা থালার মতন চ্যাপটা। আমি তাঁর কথায় তখন কান না দিয়ে পরে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম পৃথিবীটা মোটেই গোল নয়। ওরকম করার কারণ, আমি তখন মনে করতাম, পরের মুখে ঝাল না খেয়ে, ঝালের স্বাদটা কেমন, তা নিজের জিভ দিয়েই আস্বাদন করে দেখা উচিত ! কোনো জিনিসের সত্যি মিথ্যে নিজের পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যাচাই করে দেখা উচিত। কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, ওয়াইডারই ঠিক কথা বলেছিলেন ! একটা কথা আছে, আস্ত পৃথিবীর চেহারার কথা ধরলে ডগলার স্যারের কথা ঠিক আর আমাদের গাঁয়ের চেহারার কথা ধরলে আমিই ঠিক। শিক্ষকের কথাও ঠিক, ছাত্রের কথাও ঠিক ! আমি এখন দিব্যি কেটে বলতে পারি, আমাদের গাঁখানা পৃথিবীর যে অংশে দেখতে পাচ্ছি, সে-অংশটা দেখতে চ্যাপটা থালার মতই লাগছে।

প্রফেসর এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু

এই মাত্তর তিনি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। খুব তিক্ত মেজাজে আছেন তিনি। তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন, 'মূর্খের দল! তোরা বলেছিলি, এটা উড়বে না! একজন আবার পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল! গুপ্তচর লাগিয়ে তোরা এর গুপ্তরহস্য আমার কাছ থেকে বের করে নেবার চেষ্টা করেছিলি। কিন্তু আমি আজ তোদের হারিয়ে দিয়েছি। আমি ছাড়া বেলুন-জাহাজের গুপ্তরহস্যটা আর কেউই জানে না। আমি ছাড়া আর কেউ এটাকে চালাতেও জানে না। এই উড়োজাহাজটা খুব শক্তিশালী। এটা একটা নতুন বিস্ময়। বাষ্পশক্তি এর কাছে অতি তুচ্ছ। ওরা বলেছিল, আমি বেলুনে চড়ে ইওরোপেই যেতে পারবো না। ইওরোপে! এতে আছে পাঁচবছরের জ্বালানি আর তিনমাসের খাদ্য। ওরা মূর্খ। ওরা এই বেলুন-জাহাজ সম্বন্ধে কী জানে? হ্যাঁ ওরা বলেছিল, আমার এই উড়োজাহাজ অর্থাৎ বেলুন-জাহাজটা একটা অতি বাজে জিনিস। আমি তাদের দেখিয়ে দেব, এটা পঞ্চাশ বছর ধরে সচল থাকবে। আমি এটাতে চড়ে সারা জীবন ধরে আকাশে উড়তে পারব যেথা খুশি সেথা যেতে পারব! অথচ ওরা ঠাট্টা করছিল, আমি ওড়তেই পারবো না! আমি বেলুন-জাহাজটা চালাতেই পারবো না! ফুঃ! যত্তসব ইয়ে! তোমরা তিন হনুমান এই জাহাজে উঠেছিলে কেন? মজা দেখতে, চলো এখন আমার সাথে বিশ্ব ভ্রমনে। এই খোকা, জলদি ইধার আও। এই বোতামগুলোতে আঙুলের চাপ দেবে আস্তে করে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি টমকে কাছে ডাকলেন।

বেলুন চালানোর খুঁটিনাটি প্রফেসর টমকে শেখাতে লাগলেন। টম অল্পক্ষনের মধ্যেই সবকিছু শিখে নিল। ও পরে আমাদের বলেছিল, কাজটা নাকি খুবই সোজা।

টম প্রফেসরের কথা মতন এই বেলুন-উড়োজাহাজটাকে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে আনলো। ও ইচ্ছে করলে ইলিনয়েজের মাঠের চাষীদের সাথেও কথা বলতে পারতো। প্রফেসর এসময় বেলুন-জাহাজ সম্বন্ধে কিছু ছাপানো প্রচারপত্র চাষীদের দিকে ছুড়ে দিলেন। এগুলোতে লেখা লেখা ছিল—'বেলুনটা ইওরোপে যাচ্ছে।'

বেলুনটাকে একটা গাছ সোজা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে গাছটার কাছাকাছি এসে বেলুনটাকে ওপরে উঠিয়ে নিলেন, গাছটাছে মাথার ওপর দিয়ে কিভাবে চালাতে হয়, টম তা ও শিখে নিল। শুধু তাই না, প্রফেসার ওকে বেলুনটা কিভাবে মাটিতে নামাতে ওঠাতে হয়, তাও শিখিয়ে দিলেন। ও তাড়াতাড়ি কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে বেলুনটাকে তৃণক্ষেত্রের নরম ঘাসের ওপর নামিয়ে আনলো। কিন্তু যে-

মুহূর্তে আমরা বেলুনটা থেকে লাফিয়ে নীচে নামতে যাব, অমনি প্রফেসর তার কোমরে বাঁধা ছোট বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে বলে উঠলেন, 'না, না, ও-কর্মটি করো না।'

খুবই মুশকিলের ব্যাপার। আমি আর জিম তাঁকে অনেক অনুরোধ করলাম আমাদের নামতে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু তাতে শুধু তাঁর ক্রোধই বৃদ্ধি পেল! তাঁর চোখেমুখে এমন হিংস্রভাব ফুটে উঠলো, যা দেখেই আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।

তাঁর মেজাজ ফের বিগড়ে গেল। তিনি জনতার আচরণের কথা স্মরণ করে রাগে বিড়বিড় করতে লাগলেন। তারা তাঁর এই বেলুন নামক উড়োজাহাজটাকে তুচ্ছ জিনিস বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, এই রাগেই তিনি উন্মত্ত। তারা বলেছিল উড়োজাহাজটা সব সময় অচল হয়ে থাকবে। সেই 'অচল' কথাটাই এখনো পর্যন্ত তাঁর ক্রোধ আর উত্তেজনাকে 'সচল' করে রেখেছে!

তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হতে লাগলো। এরকম খারাপ মেজাজের লোক আমি আগে একটাও দেখিনি। তাঁকে দেখে আমি আর জিম ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। তিনি কেবলই প্রবল হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁর এই উড়োজাহাজ তৈরীর গোপন কলাকৌশল জগতকে কোনো দিন জানতে দেবেন না। তিনি বলতে লাগলেন, দেশের মানুষকে তাঁর কেরামতি দেখানোর জন্যে বেলুনটাকে তিনি পৃথিবীর চারদিক ঘুরিয়ে আনবেন। তারপর এটাকে আমাদের সহ সমুদ্দুরে ডুবিয়ে দেবেন! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এদিকে রাতও এসে গেল!

তিনি আমাদের খাবার খেতে দিলেন! তারপর বেলুনের নৌকোটার অন্য প্রান্তে আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন একটা বাক্সর পাটাতনের ওপর, যেখান থেকে তিনি আমাদের ওপর নজর রাখতে পারবেন। তিনি তাঁর রিভলভারটা মাথার নীচে রেখে শুলেন, আর বলে দিলেন, কেউ যদি বেলুন থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করে, তিনি সামান্য মায়া দয়া না দেখিয়ে তাকে গুলি করবেন। আমরা ভয়ে জবুথবু হয়ে রইলাম। রাত বাড়তে লাগলো, নির্জনতার মধ্যে দিয়ে। আমরা অনেকটা নীচে নেমে এসেছিলাম। চাঁদের আলো সবকিছু নরম-সুন্দর দেখাচ্ছিল। খামার বাড়িগুলো পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে নেমে পড়ি, কিন্তু উপায় নেই, যম আছে পিছে!

গভীর রাত্তিরে সব কিছু হয়ে পড়লো নিঝুম-নিস্তব্ধ। টম বললো, 'প্রফেসর যখন,

চুপ করে গেছেন উনি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অতএব এখন আমাদের করনীয় হচ্ছে—।'

'আমাদের করনীয় ?' আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম। ওর মতলবটা বুঝতে পেরে আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম।

'এখন, আমাদের একমাত্র করণীয় কাজ হচ্ছে পেছন থেকে গিয়ে প্রফেসরকে বেঁধে ফেলা, তারপর বেলুনটাকে নীচে নামানো।' বললো টম।

আমি বললাম, 'টম, মোটেই ওকাজটি করতে যেও না। বেলুন তুমি নীচে নামাতে পারবে না, শুধু শুধু প্রফেসরকে খেপিয়ে লাভ নেই।'

জিমও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমার কথায় সায় দিয়ে সে-ও বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, তুমি যা করতি চাচ্ছো, তাতে শুধু আমাদের বিপদই বাড়বে। এই প্রফেসর নোকটি খুবই সাংঘাতিক! উনি যদি পাগল না হতেন, তাহলে কোনো ঝামেলার ব্যাপার থাকতো নি। আমরাও বেলুন থেকে নামতি চাতাম না, নানা দেশ দেখতি দেখতি যেতাম। কিন্তু উনি বলতিছেন, পৃথিবীর চারদিকে একটা পাক চক্কর দিয়ে আমাদের সুমুদ্দুরের জলে ডুবিয়ে মারবেন। এনার সাথে বেলুনে চড়ে ওড়াউড়িটা ঠিক কাজ হতিছে না। আমাদের কিছু একটা এখনই করতি হবে। পরে এরকম সুযোগ আর কখনো আমরা নাও পেতি পারি। চলি এসো দিকিনি।'

ভয়ে আমাদের হাত পা অসাড় হয়ে আসছিল। আমরা দুজনে টমকে সাফ জানিয়ে দিলাম, কিচ্ছুটি করতে পারবো না। সুতরাং বেলুনটা নামানোর জন্যে টম একাই সক্রিয় হয়ে উঠলো। আমাদের কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে ও প্রফেসরের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো। প্রফেসরের মাথার কাছে গিয়ে ও দেখে নিল সত্যিই সত্যিই উনি ঘুমিয়ে আছেন কিনা। তারপর টম খুব সন্তর্পণে প্রফেসরের পায়ের দিকে এগোতে লাগলো, যেখানে বেলুনটাকে চালাবার বোতামগুলো রয়েছে। এমন সময় ওর পা লেগে কিছু একটা পড়ে গেল। জোরে শব্দ হলো।

টম পাটাতনের উপর সটান শুয়ে পড়লো। নিঃশব্দে।

প্রফেসর ধড়মড় করে উঠে চোখ খুলে বলে উঠলেন, 'কী হলো ?'

আমরা মড়ার মতন আড়ষ্ঠ হয়ে বসে রইলাম। কথার কোনো জবাব দিলাম না। প্রফেসর বিড়বিড় করতে করতে এমন লম্ফ ঝম্ফ শুরু করে দিলেন, মনে হল যেন এখুনি এসে আমাদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। এতই ভয় পেয়ে গেলাম মনে হল, যেন আমি মরে গেছি!

এসময় একখণ্ড মেঘ এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিল। আমি আনন্দে আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কি! চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে যেতেই চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। টমকে আমি আর দেখতে পেলাম না।

এরপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো। প্রফেসর চেঁচিয়ে উঠলেন। আবহাওয়াকে গাল পাড়তে লাগলেন।

আমরা দুজনে ভয় পেলাম এই ভেবে যে টমকে হয়ত উনি যে-কোনো মুহূর্তে গুলি করবেন। তাহলে আমরা খতম! কেউ আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না! এমন সময় আমার হাঁটুতে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। হাতটা প্রফেসরের ভেবে আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম! আমার হৃদস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে এলো! কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল, হাতটার মালিক প্রফেসর নন, শ্রীমান টম! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম! আনন্দে আমি টমকে জড়িয়ে ধরলাম।

অন্ধকারে বেলুনটাকে মাটিতে নামানো টমের পক্ষে সম্ভব না। তাই আমি মনে মনে কামনা করলাম, বৃষ্টি যেন না থামে। আমার ইচ্ছেই পূরণ হলো। সারা রাত ধরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়লো। তারপর সকাল হতেই তা থেমে গেল। পৃথিবীটাকে এসময় বেশ কোমল-ধূসর-সুন্দর দেখতে লাগলো। অরণ্য-প্রান্তর এত সুন্দর হয়ে আগে কখনো আমার চোখে ধরা দেয় নি।

এরপর সূর্য আরো ওপরে উঠলো তার তেজ প্রখর হলো। আমাদের আর জেগে থাকা সম্ভব হলো না। ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই।

টমের ব্যাখ্যা

আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম প্রায় ভোর চারটেয়, আর উঠে পড়লাম সকাল আটটায়। প্রফেসরকে এসময় বেশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। উনি চমৎকার ব্রেকফাস্ট খাওয়ালেন আমাদের আর বলে দিলেন, আমরা যেন বেলুননৌকোর হালের কাছে বসানো কম্পাসটার দিকে না যাই। যন্ত্রটা আছে নৌকোর মাঝামাঝি জায়গায়। আমাদের এখন মোটামুটি ভালই লাগছিল। খাওয়াদাওয়া ঠিক মতন হলে, মনে স্ফূর্তি থাকলে সবকিছুই সুন্দর মনে হয়। যদিও আমরা একজন বদরাগী কাঠখোট্টা বিজ্ঞানীর সাথে বেলুনে রয়েছি, তবুও আমরা এখন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে সুরু করলাম আমরা। একটা জিনিস আমার মাথায় গোলমাল পাকাচ্ছিল, কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। তাই আমি বলে উঠলাম, 'টম, আমরা কি পূবদিকে যাত্রা শুরু করিনি?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা এখন কত কত জোরে যাচ্ছি ?'

'প্রফেসর যা বলেছিলেন, তুমিতো তা শুনছো। উনি একবার বলেছিলেন, আমরা ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে যাচ্ছি ; আবার বলেছিলেন, ঘণ্টায় নব্বই মাইল। কখনো বলেছিলেন, একশো। উনি আরো বলেছিলেন, মাঝারি রকমের একটা ঝড়ের সাহায্য পেলে বেলুনটাকে ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে পর্যন্ত চালাতে পারা যায়।'

'তাহলে প্রফেসর নিশ্চয় মিথ্যেকথা বলেছিলেন।'

'কেন ?'

'কেন না, আমরা যদি এত দ্রুত এসে থাকি, তাহলে আমাদের এতক্ষণে ইলিনয়েজ পার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাই না।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু আমরা তো এখনো পার হয়ে যাইনি।'

'কী করে জানলে ?'

'আমি ভূপ্রকৃতির রঙ দেখে বুঝতে পারছি। এখনো আমরা ইলিনয়েজের ওপর রয়েছি। তুমি নিজেও দেখতে পার, ইণ্ডিয়ানা এখনো দেখা যাচ্ছে না।'

'হাক, তুমি কী বলতে চাইছো আমি বুঝতে পারছি নে, তুমি নীচের রঙ দেখে দেশ বুঝতে পার ?'

'নিশ্চয়ই।'

'রঙের সাথে দেশের কী সম্পর্ক ?'

'রঙের সাথেই তো সম্পর্ক। ইলিনয়েজ হচ্ছে সবুজ, আর ইণ্ডিয়ানা হচ্ছে ফিকে লাল। তুমি নীচে কোথাও ফিকে লাল দেখ.ও দেখি। পারবে না। এখনো শুধু সবুজ রঙটাই দেখা যাচ্ছে।'

'ইণ্ডিয়ানা ফিকে লাল ? স্রেফ বাজে কথা।'

'বাজে কথা না। আমি ম্যাপে দেখেছি, ইণ্ডিয়ানার রঙ ফিকে লাল।'

টম ভীষণ রেগে গিয়ে বলে উঠলো, 'বুঝলে হাক্‌ফিন, আমি যদি তোমার মতন আহাম্মক হতাম, তাহলে লজ্জায় এখান থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম। ম্যাপে দেখছি ! হাক্ ফিন, তুমি কি মনে কর, ম্যাপে দেশগুলোর যেরকম রঙ দেখা যায়, তাদের আসল রঙ সেরকম ?'

'টম সয়্যার, তাহলে তুমিই বল, ম্যাপ দেখি কেন ? আমরা কী তথ্য জানার জন্যে ম্যাপ দেখি নে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ম্যাপে যদি মিথ্যে করে কিছু দেখানো থাকে, তা দেখে লাভ কী? এটাই এখন আমি জানতে চাই।'

'বোকারাম, ম্যাপ মিথ্যে বলে না।'

'মিথ্যে বলে না?'

'না।'

'তাই যদি হয়, পৃথিবীতে একই রঙের দুটো দেশ থাকা উচিত নয়। যা ইচ্ছে করলে তুমিও এখন দেখতে পার।'

আমার অজ্ঞতায় টম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে উঠলো, 'ধর, একটা বাদামী রঙের বাছুর ও কুকুর আছে। একজন চিত্রকর তাদের ছবি আঁকছেন। চিত্রকর কী করবেন? তিনি এমন ভাবে তাদের ছবি আঁকছেন, যাতে তোমরা দেখেই মুহূর্তের মধ্যে তাদের আলাদা করে চিনতে পার। তিনি অবশ্যই তা করবেন। তাহলে কি তোমরা চাও তিনি দুটোই বাদামী রঙে আঁকুন? নিশ্চয়ই না। তিনি যদি দুটোর একটা নীল রঙের আঁকেন, তোমাদের তখন প্রানীদুটোকে চিনতে ভুল হবে না। ম্যাপেও ঠিক এই কারণে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়। তোমাদের ঠকানোর জন্যে এটা করা হয় না। তোমরা যাতে নিজেরা ঠকে না যাও, সে-জন্যই এটা করা হয়। বুঝছো।'

কাটান দেওয়ার মতন আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

জিম মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, এমন একটা ঘটনা আমি তোমাকে বলতি পারি, যা থেকে আমি প্রমাণ কইরে দেব, ছবি আঁকিয়েরা কিচ্ছুটি জানে না।' এরপর ও ঘটনাটা বলে গেল।

টম জিমের কথা শুনে রেগে উঠলো। আমাদের চুপ করে থাকতে বললো ও। হটাৎ নীচে শহরে একটা বেশ বড়ো আকারের ঘড়ি দেখতে পেয়েই সে প্রফেসরের দূরবীনের সাহায্যে তার সময়টা দেখে নিল। তারপর নিজের ঘড়িটার সাথে ওই সময়টা মিলিয়ে দেখলো। দুবার দেখার পর টম বলে উঠলো, ভারি মজার ব্যাপার তো! ওই ঘড়িটা প্রায় একঘণ্টা ফাস্ট।'

তারপর আরেকটা ঘড়ি দেখতে পাওয়া গেল। সেটাও একঘণ্টা ফাস্ট। ধাঁধায় পড়ে গেল ও। 'ব্যাপারটা দেখেছি বড়োই অদ্ভুত। আমি ধরতে পারছি নে।' এই বলে ও দূরবীণে চোখ রেখে আরো একটা ঘড়ির দিকে নজর করলো। সেটাও একঘণ্টা ফাস্ট। তারপরেই ও চোখদুটো বড়ো করে অনেক কষ্টে একটা শ্বাস নিয়ে বলে উঠলো, 'গ্রে-গ্রেট স্কট, এ যে দেখছি দ্রাঘিমার ব্যাপার!'

আমি সভয়ে বলে উঠলাম, 'কী হয়েছে টম, কোনো ভয়ের ব্যাপার নাকি ?'

'ব্যাপার যা হয়েছে, তা হল এই—ইলিনয়েজ, ইণ্ডিয়ানা, ওহিও, সেসব কিছু না। আমরা এখন রয়েছি পেনসিলভেনিয়ার পুব সীমান্তে কিংবা তারই কাছাকছি কোথাও।'

'টম সয়্যার, তুমি যা বললে, তা হয়তো বলতে চাওনি! কিছুটা বাড়িয়ে বলছ তাই না ?' আমি অবিশ্বাসীর মতন বলে উঠলাম।

'না, আমি যা বলেছি, তাইই বলতে চেয়েছি, কাল বিকেলে আমরা যখন সেণ্ট লুই শহরটা ছেড়ে আসি, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় পনেরো ডিগ্রি দ্রাঘিমা পার হয়ে এসেছি। আমরা প্রায় আটশো মাইল পাড়ি দিয়েছি।'

আমি টমের কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার অভিজ্ঞতা বলচে, একটা ভেলায় চড়ে আমরা যদি মিসিসিপি নদীর নাবালের দিকে ভেসে যাই আমরা তু-সপ্তার মধ্যে সেই পথটা পাড়ি দিতে পারবো।

জিমও ব্যাপারটায় মাথা ঘামাচ্ছিল, এখন হাস্যকর ভাষায় বলে উঠলো ও, 'মাস্টার টম, তুমি কি সত্যি সত্যি বলতি চাও, যে এখানকার ঘড়িগুলোন ঠিক সময় দিতেছে ?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছে।' টম বললো।

'তাহলে নিশ্চয় তোমার ঘড়িটা কি ঠিক সময় দিতেছেন না ?'

'সেণ্ট লুই শহরে আমার ঘড়ির সময়টা সঠিক, কিন্তু এখানে একঘণ্টা পেছনে।'

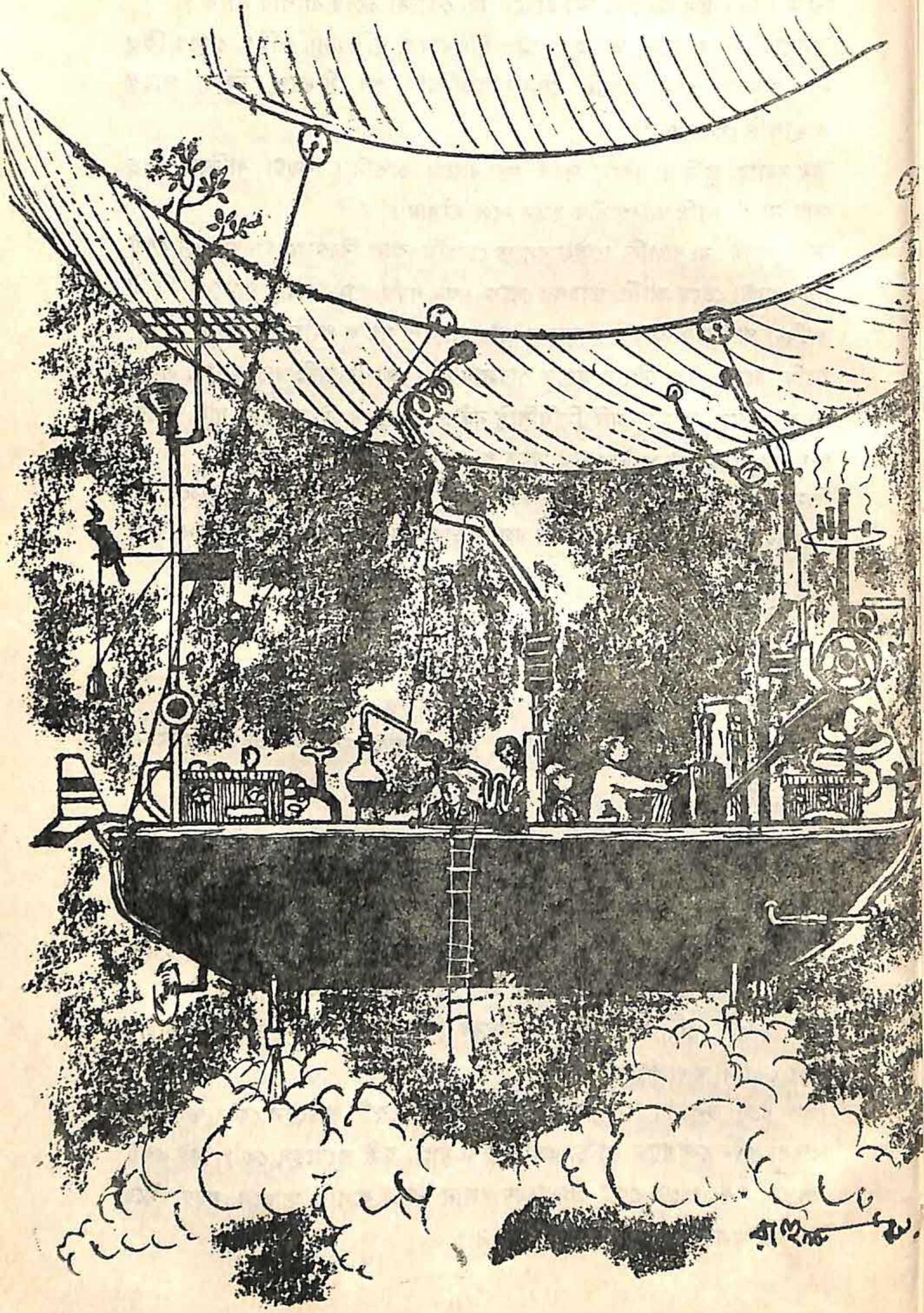
'মাস্টার টম, তুমি এটা কি বলতিছ, সব জায়গায় সময় কি একরকম হতেছেন না ?' জিমের প্রশ্ন।

'ঠিক তাই।'

জিম হতাশ হয়ে বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, তোমার এই কথায় আমার বেশ তুঃখু হলেন। তোমার মুখ থেকে এরকম ছিষ্টি ছাড়া কথা বেরোনোয় আমি বিষম লজ্জা পেলাম। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আণ্ট পলি যদি তোমার মুখ থেকে এরকম অধম্মর কথা কখনও শোনেন, তাঁর মনে বেজায় আঘাত নাগবে।'

টম বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। ও জিমের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু কোনো কথা বললো না।

জিম বলে চললো, 'সেণ্ট লুই শহরের মানুষদের স্বৃষ্টি করেছেন কে ? ভগবান। আমরা এখন যেইখানে আছি, এখানেই বা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে ? সেই একই ভগবান। সব মানুষ একই ভগবানের সন্তান কিনা বলো ? তাহলে সময় নিয়ে এরকম আলাদা আলাদা মাপ হবে কেন ?'



আলাদা মাপ! এরকম বোকা তো দেখিনি। এতে কোনো আলাদা মাপ নেই। তোদের ভগবান যখন তাঁর কিছু সন্তানকে কালো, আর বাকিদের সাদা করে সৃষ্টি করেন, তখন সেটাকে কী বলিস?'

জিমের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কোনো জবাব খুঁজে পেল না ও।

টম বলে চললো, তাহলে দেখ্‌ 'তিনি তার খুশি অনুযায়ী রঙ বেরঙের আলাদা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এটা মানুষের সৃষ্টি। ভগবান দিন-রাত্রির সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি ঘড়ি-ঘণ্টার ব্যাপারটা আবিষ্কারও করেন নি, ভাগও করে দেন নি। এটা মানুষ তার সুবিধে আর প্রয়োজন অনুযায়ী করেছে।'

'মাস্টার টম, তুমি যা বলবেন, সেটা কি ঠিক? ঘড়ি-ঘণ্টার এই ব্যাপারটা কি ভগবান করেন নি মানুষ সৃষ্টি করেছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু একটা কথা তুমি বলো দিকিনি এরকমটা কে তাকে করতি বলেছিল?'

'কেউই না। মানুষ তার প্রয়োজনের জন্য নিজেই সৃষ্টি করছে।'

জিম মিনিটখানেক ভেবে নিয়ে বলে উঠলো, 'তাহলে আজ আমি হেরে গেলাম। তবুও এটা বলবো, মানুষ বেজায় খেয়ালখুশি মতন কাজ করতেছেন। সব জায়গায় একঘণ্টা করে সময়ের হেরফের করে ফেলতেছেন। তাই না?'

'একঘণ্টা? না হে, না। একডিগ্রী দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্যে সময়ের পার্থক্য হয় মাত্র চার মিনিট। এটা জেনে রাখো। পনেরো ডিগ্রী পার্থক্যে সময়ের পার্থক্য হয় ষাট মিনিট বা একঘণ্টা। তিরিশ ডিগ্রী পার্থক্যে হয় দুঘণ্টা। এরকম। মঙ্গলবার সকালে ইংলণ্ডে সময় যখন রাত একটা, নিউইয়র্কে চলছে তখন তার আগের রাত (যে-রাত এখনো আসেনি), সময় সেখানে তখন রাত আটটা।'

জিম বেলুন নৌকাটার পাটাতন বরাবর একটু এগিয়ে গেল। দেখে মনে হলো, ও বেশ অপমানিত হয়েছে। মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে আপন মনে বকতে লাগলো সে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে গেলাম, ফল হলো বিপরীত। জিম বলে উঠলো, 'মাস্টার টম তাহলে বলতি চাতিছেন, একই দিনে এক জায়গায় হবে মঙ্গলবার, আরেক জায়গায় হবে সোমবার! মাষ্টার হাক্‌, এটা তো ঠাট্টা ইয়ার্কি করার ব্যাপার নয়। হায় ভগবান, একই দিনে দুটো বার! একটা দিনে দুটো বার কী করে হয়? দুটো ঘণ্টা কি করে একটার মধ্যে ঢুকতে পারে? একটা নিগ্রোর চামড়ার মধ্যে কি দুটো নিগ্রো থাকতে পারে?

এক গ্যালন মাপের একটা জগের মধ্যে কি দু-গ্যালন মদ ধরতে পারে ? আমি বলছি, তা কখনই হতে পারে না। হাক্ ফিন মনে কর, মঙ্গলবারে নববর্ষ। তাহলে কি এটা বলা চলে, একজায়গায় সেটা এবছরের নববর্ষ, অন্য জায়গায় সেটা গত বছরের নববর্ষ, দুটোই একই সময়ে ? আমি এটা কিছুতেই মানতি পারতেছি নে। আর এ-সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু শুনতেও চাচ্ছি নে।'

টম এসময় বলে উঠলো, 'জিম, হলো কী তোর ?'

জিম ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে কোনো রকমে ভাঙাভাঙা শব্দে উচ্চারণ করলো, 'মাস্টার টম, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করতিছিলে না তো ? যা বলতিছিলে তা কি সঠিক ?'

'না মোটেই ঠাট্টা করিনি। ঠিকই বলেছি।' টম বললো।

জিম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলো, 'তাহলে সোমবারটাই হয়তো ইংলণ্ডের শেষ দিন ছিল ! দুনিয়াটা উলট পালট হয়ে গেছে, সব হয়তো শেষ হয়ে গেছে সেখানে ! মাস্টার টম, আমরা আর সেখানে যাব না। দয়া করে প্রফেসরকে বলে বেলুনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল। আমার কথাটা শোন—'

হঠাৎ এমন একটা জিনিস আমাদের নজরে এলো, যা দেখার জন্যে আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, আর স্থানকালের এইসব কথাও বেমালুম ভুলে গেলাম।

'আরেব্বাস্, এ যে দেখছি একেবারে মহাসাগর !' দম ছেড়ে বললো টম।

আমি আর জিমও বিষম অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম দিগন্ত বিস্তৃত উত্তাল নীল সমুদ্রের পানে। তারপর আমরা সবাই মহা আনন্দে মহাসাগর দেখতে লাগলাম, এর আগে আমরা কখনো মহাসাগর দেখিনি। দেখবো বলে আশাও করিনি কখনো।

টম বিড়বিড় করে বলে চললো, 'আটলান্টিক মহাসাগর—আটলান্টিক ! কী সৌভাগ্য, আমরা আটলান্টিকের উপরে রয়েছি ! এ যে বিশ্বাস করতে পারছি নে !' এরপর আমরাদেখতে পেলাম কালো ধোঁয়ার মতন একটু তীরভূমি। আমরা তার উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দেখলাম সেটা একটা নগর। একটা বিশাল নগর। তার একপাশে দেখা যাচ্ছে ঘন জাহাজের সারি। সেটা নিউইয়র্ক কিনা, তা নিয়ে আমাদের ভেতর প্রবল মতবিরোধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে নগরটা যেন পিছলে আমাদের পেছনে চলে গেল ! আমরা আবার মহাসাগরের উপর এসে পড়লাম। ঝড়ের বেগে উড়ে চললো আমাদের বেলুন নামক উড়োজাহাজটা। আমরা তক্ষুনি উঠে পড়লাম। বুঝতে পারলাম আমাদের আর বাড়ি ফিরবার কোন আশা নেই।

কান্নাকাটি জুড়ে দিলাম আমরা। উড়োজাহাজটা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, আমাদের নামিয়ে দেওয়ার জন্যে, প্রফেসরের কাছে কত কাকুতিমিনতি করলাম, বললাম বাড়ির সবাই কান্নাকাটি করবে। কিন্তু উনি ভীষণ রেগে আমাদের দিকে পিস্তলের নলটা তাক করে ধরলেন, নামিয়ে দেওয়ার কথাটায় কোন আমলই দিলেন না। আমরা যে এসময় কি রকম খারাপ মানসিক অবস্থা নিয়ে আকাশপথে মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চললাম, তা কেউই কখনো জানতে পারবে না!

ডাঙা শেষ হয়ে গেল। জলের সীমানায় দূরে সাপের মতন একচিলতে যে-টুকু ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, সেটুকুও দেখলাম দৃষ্টির বাইরে চলে গেল! আমাদের নীচে এখন শুধু মহাসাগর—মহাসাগর—মহাসাগর! মিশেছে যেয়ে দিগন্তের কাছে নীল আকাশের সাথে, হাজার হাজার মাইল জুড়ে রয়েছে এই মহাসাগর! ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে চলেছে সাদা সাদা ফেনা! দূরে দূরে কয়েকটি জাহাজ কেবল চোখে পড়ছে। একটু বাদেই সব মিলিয়ে গেল! এখন রইলো শুধু মাথার ওপর নীল মহাকাশ, আর পায়ের নীচে নীল মহাসমুদ্র! এরকম সুবিশাল নিস্তব্ধ পরিবেশ আগে কখনো কল্পনাও করতে পারি নি! কি আশ্চর্য দৃশ্য!

ঝড়

অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে এসে পড়লাম আমরা। ওপরে বিশাল খোলা আকাশ, নীচে নির্জন মহাসাগর। ঢেউ ছাড়া জলে আর কিছু নেই। আমাদের চারদিকে রয়েছে দিগন্ত রেখা, যেখানে মহাসাগর আর মহাকাশ মিলে গেছে একসাথে। আমরা রয়েছি মহাসাগরের মাঝামাঝি জায়গায়। আমরা প্রবল বেগে উড়ে চলেছি আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতন, কিন্তু তবুও দিগন্তরেখার কোনোদিকের দূরত্বের কোনো হেরফের হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না আমার। যেন তার মাঝখানে মড়ার মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

ব্যাপারটা আমাদের কাছে এতই বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল যে আমরা হতাশ হয়ে পাটাতনের উপর বসে পড়ে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলছিলাম। ক্রমশ আমরা কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। শেষে এমন হলো, দীর্ঘ সময় আমরা কথা বন্ধ রেখে শুধু এই আশ্চর্য ঘটনার বিষয়ে ভাবতেই থাকলাম। যতই ভাবি, ভাবনা আরো বেড়ে যায়!

সূর্য মাথার ওপর উঠে এলে প্রফেসর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। উনি উঠে দাঁড়িয়ে একটা তেকোনা যন্ত্র চোখে লাগিয়ে সূর্যের দিকে তাক করে দেখতে লাগলেন। টম বললো, যন্ত্রটার নাম সেক্সটান্ট, কোন জায়গার অবস্থান জানবার জন্য জ্যোতির্বিদরা ওটা ব্যবহার করেন। সূর্য দেখে বেলুনটার অবস্থান প্রফেসর এখন জেনে নিতে চান। উনি যন্ত্রটা চোখ থেকে নামিয়ে একটু অঙ্ক কষলেন। তারপর একটা বই বের করে তার ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলোলেন। তারপর আবার সূর্য দেখতে লাগলেন। এসময় উনি অনেক দুর্বোধ্য কথা আউড়ে গেলেন। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, আসছে কাল বিকেলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যদি এইরকম একশো মাইল গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, তাহলে এর মধ্যে উনি বেলুনটাকে লণ্ডনে নামাতে পারবেন।

'আমরা তাহলে বেঁচে যাই!' বলাবলি করলাম আমরা।

আমাদের কথাটা শুনেই প্রফেসর বিদ্যুদ্‌বেগে ঘুরে প্রচণ্ড ঘৃণা আর সন্দেহ-ভরা চোখে আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'ও তোমরা আমাকে ছেড়ে যেতে চাও? কথাটা আবার এখন অস্বীকার করবার চেষ্টা করো না।'

কী বলবো বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম আমরা।

উনি বেলুন-নৌকোর পেছনের অংশে গিয়ে ব্যাজার মুখে বসে পড়লেন।

কিন্তু কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন বলে মনে হলো না আমার। উনি হয়তো যখন তখন এ-ব্যাপারে আমাদের মুখ থেকে কিছু বের করার চেষ্টা করে থাকেন। তবে আমরা আর কখনো মুখ খুলবো না। আমরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি ঠিক করে নিলাম এটা।

নিসঙ্গতা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। রাত্তির নেমে এলে আমি সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় এসে দাঁড়ালাম।

এসময় টম আমাকে চিমটি কেটে ফিসফিস করে বললো, 'ঐদিকে তাকিয়ে দেখ।'

বেলুন-নৌকোর পিছনের অংশে একঝলক তাকিয়ে দেখলাম, প্রফেসর একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছেন। একটা বোতল শেষ করে উনি আরেক বোতল থেকে খেতে শুরু করলেন। তারপরই গান গাইতে সুরু করলেন উনি।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। তা ক্রমশ গাঢ় হলো। প্রবলবেগে ঝড়ো বাতাস বইতে লাগলো। প্রফেসর নিজের মনে গেয়ে চললেন গান। সঙ্গে শুরু হলো নাচ—দুহাত তুলে পাটাতনের উপর দাপাদাপি। ক্রমশঃ বেড়ে চললো তাঁর

পাগলামি, মাতলামি। সেই সাথে বেড়ে চললো বজ্রের গর্জন, ঝড়ের মাতন। বেলুনের দড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে ঝড়ো বাতাস বইতে লাগলো সাঁ সাঁ করে। সবকিছু মিলে পরিস্থিতিটা হয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর! সত্যিই ভয়ঙ্কর! প্রচণ্ড বেগে উড়ে চললো বেলুন। জমাট অন্ধকারের মধ্যে প্রফেসরকে আমরা দেখতেই পাচ্ছিলাম না। শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম ওর গান। ঝড়ের গর্জন ছাপিয়েও ভেসে আসছিল ওর গান।

দশ মিনিট চুপচাপ কাটলো। অন্ধকারে ওঁকে সত্যি দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো। এমন সময় ঝলকে উঠলো বিদ্যুৎ। তার আলোয় দেখতে পেলাম উনি উঠে দাঁড়িয়ে টলমল করে পা ফেলে হেঁটে আসছেন আমাদের দিকে। কিন্তু পারলেন না, পড়ে গেলেন। উনি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরা ইংলণ্ডে নেমে পালাতে চায়, পৃথিবী ভ্রমণে যেতে চায় না! ঠিক হ্যায়, আমি ওদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। ওরা আমাকে ছেড়ে যেতে চায়! আমি জানি, ওরা তাই-ই চায়, ওরা নিশ্চয়ই তাই চায়। এখনই ওদের মজা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

প্রফেসরের এই সব কথা শুনে আমার মনে হলো, হয়ত আমাদের উনি নিজের হাতে খুন করবেন! এরপর কিছুক্ষণ ওঁর চীৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম না! মনে মনে কামনা করলাম, বিদ্যুৎ যেন আর না ঝলকায়। প্রফেসরের উন্মত্ত হিংস্র চেহারা আমাদের যেন আর না দেখতে হয়! আমরা পেছোতে পেছোতে একেবারে কাঠের গায়ে সেঁটে গেলাম।

কিন্তু বিদ্যুৎ আবার ঝলকে উঠলো। এবার দেখলাম, উনি হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছেন! উনি আমাদের থেকে চারফুটও দূরে নেই! ওঁর চোখদুটো যেন প্রচণ্ড রাগে জলছে! ওঁর লক্ষ্য মনে হয় টমের দিকে। বন্দুক দিয়ে টমকে একটা খোঁচা মেরে উনি বলে উঠলেন, 'এখনই উড়োজাহাজ থেকে জলে লাফিয়ে পড়। লাফাও। জলদি।'

এসময় অন্ধকারে আবার সব ঢেকে গেল। আমি তাই দেখতে পেলাম না, উনি টমকে ধরতে পারলেন কিনা। টমেরও কোনো সাড়া পেলাম না।

দীর্ঘ নীরবতা। ভয়ানক সেই নীরবতা! তারপর আরেকবার বিদ্যুতের ঝলকানি। এবার দেখতে পেলাম, টমের মাথাটা বেলুন-নৌকোর বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। যে সিঁড়িটা বেলুন-নৌকোর গায়ে বাঁধা অবস্থায় বাইরে ঝুলছিল, সেটার ধরে বাইরে নেমে যাচ্ছিল টম। প্রফেসরও একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়লেন বেলুন-নৌকো থেকে টমকে ধরার জন্যে। আবার অন্ধকারে সবকিছু

ঢেকে গেল। আলকাতরার মতন কালো আর ঘন সেই অন্ধকার! জিম আর্তনাদ করে উঠলো, 'মাস্টার টম! প্রফেসর তোমাকে ধরে ফেললো!' এই বলে ও-ও একটা লাফ মারলো। কিন্তু ও যেদিকে লাফ মারলো, প্রফেসর



সেদিকে ছিলেন না। একজোড়া তীক্ষ্ণ চি-কার কানে এলো আমার, তারপর আরেকটা চিৎকার। এটা তত জোরালো না, তারপর আরেকটা চীৎকার। এটা কোনো রকমে শোনা গেল। চিনতে পারলাম গলাটা। এটা জিমের গলা। ওকে বলতে শুনলাম, 'মাস্টার টম!'

আবার সেই ভয়ঙ্কর নীরবতা! আবার যখন বিদ্যুৎ চমকালো, সেই চমকানির সময়ে একটা লোক বড়ো জোর এক থেকে চার পর্যন্ত গুনতে পারে। বিদ্যুতের আলোয় এবার দেখতে পেলাম, জিম পাটাতনের উপর মাথা রেখে দুহাতে সেটা চেপে ধরে হাঁটুগেড়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি বেলুন-নৌকোর কিনারার দিকে তাকানোর আগেই অন্ধকার সবকিছুকে গ্রাস করলো। আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম এজন্যে যে, ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা আমাকে দেখতে হলো না! কিন্তু পরের বার যখন বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, তখন দেখলাম, কেউ একজন বাইরের সিঁড়ির ওপর বসে ঝড়ো বাতাসে দুলছে! তার নীচে রয়েছে শূন্যতা! তারও নীচে রয়েছে উত্তাল মহাসাগর! একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যু! এই 'কেউ একজন'-টা আর কেউ না, স্বয়ং টম!

'উঠে এসো।' আমি চিৎকার করে বললাম। 'উঠে এসো টম।'

টমের গলার স্বর এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল আর ঝড়ের গর্জন এত প্রচণ্ড ছিল যে, ও যা বললো, তার বিন্দুবিসর্গ আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমার মনে হলো, ও জানতে চাইছে প্রফেসর ওপরে আছেন কিনা। আমি চেঁচিয়ে ওকে বললাম, 'না, প্রফেসর ওপরে নেই। তিনি এতক্ষণ মহাসাগরে সাঁতার কাটছেন। জলদি উঠে এসো। আমি কি তোমাকে সাহায্য করবো?'

অবশ্যই, আমি যা বললাম, ঘটনাটা সেরকমই ঘটেছিল! আর তা ঘটেছিল ঘন অন্ধকারের মধ্যে!

'হাক্, চেঁচিয়ে কে ডাকলো?' জিম জানতে চাইলো। অর্ধচেতন অবস্থা তার।

'আমিই চেঁচিয়ে টমকে ডাকলাম।'

'ওহ, মাষ্টার হাক্, তোমার কত মায়া! কত দয়া! নিশ্চয়ই তুমি জানো মাস্টার টম—।' এই পর্যন্ত বলেই জিম একটা তীব্র আর্তনাদ করে মাথা আর হাতদুটো পেছন দিকে ছুঁড়তে লাগলো। তারপর আরেকটা আর্তনাদ করে উঠলো ও। কেন না, ঠিক এসময় আরেকবার ঝলকে উঠলো বিদ্যুৎ। ও মাথাটা উঁচু করে এ-সময় দেখতে পেলো টমের বরফ-সাদা মুখটা। টম এসময় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে বেলুন-নৌকোর কাঁদার ওপর দিয়ে সোজা জিমের দিকে তাকিয়েছিল। টমের বৃষ্টিভেজা সাদাটে চোখ মুখ দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল জিম বেচারা। ও ভেবেছিল, টম বোধহয় মরে ভূত হয়ে উঁকি মারছে ওর দিকে!

টম উড়োজাহাজের ওপর উঠে এলো। জিম যখন দেখলো সত্যিই ও টম, টমের ভূত নয় তখন টমকে নিয়ে কী করবে, কোথায় রাখবে তা যেন বুঝতেই পারলো না ও। এতো বেশী আনন্দ হলো আমি টমকে বললাম, তুমি এত দেরি করছিলে

কেন ? প্রথমে উঠে আসেনি কেন ?'

'কেন পারি নি বলছি, আমি জানতাম, কেউ একজন নীচে পড়ে গেছে। কিন্তু অন্ধকারে আমি বুঝতে পারি নি, সে কে। তুমিও হতে পারতে, জিমও হতে পারতো।'

এই হচ্ছে টম সয়্যার ! সব সময় বুঝে সুঝে কাজ করে। প্রফেসর কোথায়, তা যতক্ষণ ও বুঝতে পারে নি, ততক্ষণ ও উড়োজাহাজের পাটাতনের ওপর উঠে আসেনি।

এসময় প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছিল। ব্রজ্রপাতে খান খান হচ্ছিল দুর্যোগের আকাশ। বিদ্যুতের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল অন্ধকারের কালো পর্দা। ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জনে আমরা সন্ত্রস্থ হয়ে উঠেছিলাম, আমাদের বেলুনটা যেন ধ্বংস হয়ে যাবে এক্ষুনি। এমন সময় বৃষ্টি নামলো !

এই মূহূর্তে তুমি তোমার হাতটাই দেখতে পাচ্ছ না, পরের সেকেণ্ডেই আবার তুমি তোমার কোটের হাতার সুতো পর্যন্ত দেখতে পারছো ! আর সেই সাথে দেখতে পাচ্ছ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের বিশাল একটা অংশ !

সমুদ্দুরের ঝড় নিঃসন্দেহে একটা দেখবার মতন বস্তু। কিন্তু তুমি যদি আকাশে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেসে বেড়াও, নিঃসঙ্গ ভিজে অবস্থায় থাক, তখন সেই ঝড় দেখতে নিশ্চয়ই তোমাদের খুব খারাপ লাগবে। বিশেষ করে পরিবারের বা ঘরের সবার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে জানলে তো কথাই নেই। খারাপ লাগবেই।

সমুদ্রের ওপর আকাশে ভাসতে ভাসতে নীচু গলায় প্রফেসরের সম্বন্ধে নানা কথা বলছিলাম। আমরা প্রতেকেই ওঁর জন্যে দুঃখ অনুভব করছিলাম। জগৎ ওঁকে চিনতে পারলো না ! কৌতুক করলো ওঁকে নিয়ে ! নির্দয় ব্যবহার বরলো ওঁর সাথে ! যখন উনি ওঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটা সম্পন্ন করছিলেন, তখন উনি কোন বন্ধু পান নি। কেউই ওঁকে প্রেরণা জোগায় নি, বরং অনেকেই ওকে অন্যমনস্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, বিদ্রূপ করেছে, বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ওঁর মহৎ কাজ ! বেচারা ! প্রফেসর ! মানুষ চিনতে পারলো না তোমাকে !

বেলুন-জাহাজের মধ্যে কাপড়চোপড়; কম্বল ইত্যাদি জিনিস প্রচুর পরিমানে রয়েছে। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম; আমরা বৃষ্টিতে ভিজবো, কিন্তু ওগুলো ছোঁবো না। কিছুতেই না।

ভাঙা

আমরা কিছু পরিকল্পনা ছকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু একমত হতে পারলাম না। আমি আর জিম বাড়ি ফিরে যাওয়ার পক্ষে। কিন্তু টম চাইলো, সূর্য না ওঠা পর্যন্ত বেলুন জাহাজটা যে-দিকে যাচ্ছে, সেদিকেই ওটাকে যেতে দিতে। পরে দিনের আলোয় আমরা আমাদের পথ চিনে নিতে পারবো। তাছাড়া এমনও হতে পারে, আমরা হয়ত তখন ইংলণ্ডের কাছাকাছি চলে যাব এবং নেমেও পড়তে পারব। তারপর সহজেই সেখান থেকে জাহাজে চড়ে আমেরিকায় ফিরে যাওয়া যেতে পারবে। সেই সাথে অভিযানের গৌরবও লাভ করা যাবে।

প্রায় মাঝরাত্তিরে ঝড় থামলো। চাঁদ দেখা দিল। তার আলোয় মহাসাগর ঝিলমিলিয়ে উঠলো। এখন আমরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি। মহানন্দে পাটাতনের ওপর শুয়ে লম্বা ঘুম দিলাম। সূর্য ওঠার আগে আমরা ঘুম থেকে উঠলাম না। সমুদ্র হীরের মতন জ্বলজ্বল করছে আবহাওয়াও খুব সুন্দর। একটু বাদেই আমাদের জিনিসপত্তর ও জামাকাপড়গুলো শুকিয়ে গেল।

ব্রেকফাস্টের খোঁজে আমরা উড়োজাহাজের পেছন দিকটায় গেলাম। সেখানে প্রথম যে-জিনিসটা আমাদের নজরে এলো, সেটা হচ্ছে একটা কম্পাসের আলো। সেটা ঢাকা রয়েছে একটা কাচের আবরণের নীচে। ওটা দেখে টম চনমনিয়ে উঠলো। বললো, 'এটার কাজ কী জানতো? খুবই সোজা, জাহাজ যেভাবে চালানো হয় তেমনি ভাবে এটা দেখে যে কেউ এই উড়োজাহাজটাকেও চালাতে পারে। অথবা বাতাসের গতির সাথে বেলুনের গতিও মিলিয়ে চালাতে পারে। এটা দেখে বোঝা যায়, আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি।'

'তাহলে যন্ত্রটা দেখে তুমি বলে দাও বেলুনটা এখন কোনদিকে চলেছে?' আমি শুধোলাম।

টম বললো, 'এটা বেশ জোরে উড়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা বেশ উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসকে সাথী করে দক্ষিণ-পূব দিকে এটা উড়ে চলেছে এখন। তবে এটা ঠিক কদ্দুর এসেছে সেটা বুঝতে পারছিনে।'

সুতরাং টম উড়োজাহাজটার গতি পুবমুখী করে দিল। ও জানালো, ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত সে ওদিকেই চালাতে থাকবে বেলুনটাকে। একটা লোকের যা কিছু প্রয়োজন, সবকিছুপ্রায় এই বেলুনে মজুত আছে। কফির জন্যে দুধ না থাকলেও জল ছিল। তুমি যা যা চাও প্রায় সবই ছিল। এমনকি ছোট একটা কাঠকয়লার

উনোনও ছিল। পাইপ, সিগার, দেশলাই, মদ, এসবও ছিল। তবে আমাদের এগুলোর দরকার ছিল না। তাছাড়া মজুত ছিল অনেক ভারী ভারী বই, ম্যাপ, চার্ট আর একটা বাদ্যযন্ত্র আর প্রচুর পশমের পোশাক, কম্বল ইত্যাদি। আর ছিল কিছু অদরকারী জিনিস, যেমন পেতলের হার, পেতলের গিল্টি করা করা গয়নাগাঁটি। টম বললো, 'এই গয়নাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, অসভ্যদের দেশ ঘুরে দেখার মতলব ছিল প্রফেসারের। একটা বাক্সে প্রচুর টাকাও ছিল। প্রফেসার এখানে কোনো দিক থেকে কোনো ত্রুটি রাখেন নি!

প্রাতরাশ খাওয়ার পর টম আমাকে আর জিমকে বেলুনটার স্টিয়ারিং ধরা শিখিয়ে দিল। আমরা প্রত্যেকে চারঘণ্টা করে বেলুনটা চালাবো বলে স্থির করলাম। টমের পালা শেষ হলে আমি ওর জায়গায় গিয়ে বসলাম। ও এসময় প্রফেসরের ড্রয়ার থেকে কাগজ আর কলম নিয়ে আণ্ট পলির কাছে চিঠি লিখতে বসলো। এপর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, সবই বিস্তারিত ভাবে লিখলো। ওপরে তারিখের কাছে ঠিকানা লিখলো, 'আকাশ-যানে, ইংলণ্ডের পথে।' কাগজটা ভাঁজ করে আঠা দিয়ে সিল করে দিল। তারপর পলি মাসির ঠিকানা লিখলো আর প্রেরকের জায়গায় লিখলো, 'টম সয়্যার—আকাশচারী।' তারপর বললো, ডাকপথে পোস্টমাস্টার হ্যাট পার্জন্সের কাছে যখন এটা যাবে, তখন তিনি নিশ্চয়ই এটার ওপর স্ট্যাম্প মারবেন। টমের মতে সেটা বেশ মজার ব্যাপার হবে!

আমি বললাম, 'কিন্তু টম সয়্যার, এটা মোটেই আকাশ নয়, এটা হচ্ছে একটা বেলুন।'

'বুদ্ধরাম, এটাকে আকাশ কে বলেছে?'

'তুমি যে চিঠিতে লিখলে!'

'তাতে কী হয়েছে? তার মানে এই না, বেলুনটাই হচ্ছে আকাশ।'

'ব্যাপারটা হচ্ছে আলংকারিক। লোকে ভাঁজ করা জামা গায়ে দেয় কেন? ভাঁজটা নিশ্চয়ই শরীরকে গরম রাখে না। রাখে কি?'

তা রাখে না।'

'কিন্তু তারা তবুও সার্ট ভাঁজ করে রাখে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সেরকম আমার চিঠিটা হচ্ছে একটা সার্ট; আর আকাশটা হচ্ছে একটা ভাঁজ।' এই বলে রূপক ও অলংকারের কথা পেড়ে বসলো সে!

টমের কথা জিমের পছন্দ হলো না। ও তর্ক করতে চাইলো। টম ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

জিম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, রূপক কথাটার মানে কী ?'

টম একটা ব্যাখ্যা দিল। জিমের সেটা পছন্দ হলো না। টম এসময় বলে উঠলো 'এখন একটু ক্ষান্ত দে। তোর ভোঁতা মাথায় এসব জিনিস সহজে ঢুকবে না। আমাকে আর বিরক্ত করিস নে।'

জিম সন্তুষ্ট হয়ে থেমে গেল। ওর সন্তুষ্টির কারণ, টমকে ও হারাতে পেরেছে। টম টেনে এনেছিল একটা পাখির উপমা। জিম সেটাকে কথার গুলিতে বিদ্ধ করে দিল !

আকাশের ব্যাপারটা আমার মাথায় এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে। ফের কথাটা বলতেই টম আমাকে বুঝিয়ে দিল, অনেক সময় অনেক জিনিস একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে হয়। সাংবাদিকরা এরকম করেন। ও-ও তাই করেছে, চিঠিতে বেলুনের জায়গায় আকাশ বসিয়ে। এবার কথাটা আমি মেনে নিলাম।

টম খুশি হয়ে বলে উঠলো, 'শোন হাক্, এখন থেকে আমরা আর পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবো না। আমরা যখন লণ্ডনের মাটিতে নামবো, তখন আমরা বেলুনটাকে আকাশযান বলেই প্রচার করবো। ভুল হয় না যেন।'

টম এসময় জানিয়ে দিল, বেলুনে চড়ে যারা আকাশে ভেসে বেড়ায়, তাদেরকেই বলে আকাশচারী। 'পর্যটক টম সয়্যার' কথাটার চেয়ে 'আকাশচারী টম সয়্যার' কথাটা শুনতেও অনেক ভাল। যদি আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক চলে, সারা পৃথিবীতে আমাদের আকাশ-পরিক্রমার কথা ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই আকাশ-যানে চড়ে নিছক 'পর্যটক' আখ্যা নেওয়ার ইচ্ছে টমের নেই !

বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে মাটি দেখার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হলাম। বলতে দ্বিধা নেই বেলুনে আমাদের ভালই লাগছে। গর্বও বোধ করছি। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের সময় চোখে দূরবীণ লাগিয়ে যে-ভাবে ডাঙা দেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমরা সেরকম ভাবে সামনের দিকে, ডাইনে বাঁয়ে নজর রেখে চললাম। কিন্তু মহাসাগর ছাড়া আমাদের নজরে আর কিছুই এলো না ! বিকেল চলে গেল, সূর্য ডুবে গেল, কিন্তু তবুও কোথাও ডাঙার দর্শন মিলল না !

আমরা বেশ অবাক হলাম। তবে মনে আশা রাখলাম সব কিছু নিশ্চয়ই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আশায় ভর করে আমরা বেলুনটাকে পুবদিকে চালাতে লাগলাম। অন্ধকারে যাতে এটা কোনো পর্বতেটর্বতে ধাক্কা না খায়, সে জন্যে এটাকে অনেক ওপরেও তুলে দেওয়া হলো।

মাঝরাত্তির পর্যন্ত আমার উপরে চালানো ও নজর রাখার পালা ছিল। আমার

পরে ছিল জিমের পালা। কিন্তু ওর পরিবর্তে টম নিজেই বেলুনটা চালানোর দায়িত্ব নিল।

দিনের আলো ফুটে উঠতেই জিম চেঁচিয়ে উঠলো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। নীচের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম স্থলভূমি, চারদিকে শুধু ধূসর মাটি! যদ্দুর চোখ যায় শুধু দিগন্ত বিস্তৃত খোলা প্রান্তর। কতক্ষণ ধরে যে আমরা এই ডাঙার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি, খেয়ালই করি নি।

এখানে না দেখা যাচ্ছে কোন গাছ পালা, না আছে পাহাড়-পর্বত কিংবা কোন গ্রাম শহর! তাহলে ডাঙা কিসের! জায়গাটাকে টম মহাসাগরের অংশ বলেই ধরে নিল। স্বীকার করছি, আমরা খুব ওপরে ছিলাম বলে ডাঙা না জল ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না। প্রচণ্ড উত্তেজনায় চোখে দূরবীন লাগিয়ে আমরা চারদিকে শুধু লণ্ডনই খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় লণ্ডন? লণ্ডন দূরের কথা, একটা হ্রদ কিংবা নদীর চিহ্ন পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম না!

টম জানালো, ইংলণ্ডকে দেখতে অনেকটা আমেরিকার মতন হবে বলেই ওর ধারণা ছিল। তাই এখন এই দেশটাকে সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখে ও রীতিমতন মনমরা হয়ে পড়লো। সম্ভবত মনমরা ভাবটাকে আড়াল করার জন্যেই ও বললো, 'আগে পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাক, তারপর লণ্ডন যাওয়ার সর্টকার্ট রাস্তাটা খোঁজা যাবে।'

ঝটপট ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেলুনটাকে নীচে নামাতে লাগলাম। আবহাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল। গা থেকে সবাই গরম জামা কাপড় খুলে ফেললো। মাটির কাছাকাছি আসতেই ভীষণ উত্তাপ অনুভব করলাম। গায়ে যেন ফোসকা পড়ে যাবে!

মাটি থেকে তিরিশ ফুট উঁচুতে আমরা বেলুনটাকে থামালাম। বালিকে যদি মাটি বা ডাঙা বলা হয়, তাহলে এটা নিশ্চয়ই ডাঙা। চারপাশে শুধু বালি আর বালি!

টম আর আমি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে পড়লাম। পাগুলোকে খেলানোর জন্যে আমরা বালির ওপর দৌড়ঝাঁপ সুরু করলাম।

খুবই মজা লাগছিল আমাদের। কিন্তু বালি এসময় জ্বলন্ত কয়লার মতন গরম হয়ে উঠেছিল। আমাদের পা পুড়ে যাচ্ছিল। পরক্ষণেই আমাদের মনে হলো কেউ একজন যেন চেঁচামেচি করছে। তাকিয়ে দেখি, জিম ওপরে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচাচ্ছে আর লাফাচ্ছে। ও সংকেত করে কিছু একটা বলতে চাইছে আমাদের। ওর কথার মাথামুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না! তবুও আমরা ভয়

পেয়ে ছুটে বেলুনের দিকে ফিরতে লাগলাম। আমরা যখন বেলুনটার কাছাকাছি এসে গেছি, তখন জিমের কথা আমরা শুনতে পেলাম। আর তা শুনে বেজায় ভয়ও পেয়ে গেলাম।

জিম বলছে, 'দৌড়োও। যদি বাঁচতে চাও, বেলুন উঠে পড়ো। একটা সিংহ ছুটে আসছে। আমি দূরবীণ দিয়ে তাকে দেখতে পাচ্ছি। শীগগির দৌড়ে এসো। যত জোরে পার, ছুটে বেলুনে ওঠ।

জিমের কথা শুনে টম যেন উড়ে চললো। কিন্তু আমার পা-দুটো যেন আড়ষ্ঠ হয়ে পড়লো। জোরে ছুটতে পারছিলাম না। স্বপ্নের মধ্যে একটা ভূতকে যদি তোমাদের দিকে আসতে দেখ, তখন যেমন তোমাদের পা নড়তে চায় না, আমারও এখন ঠিক সেই অবস্থা হলো!

টম সিঁড়িটার কাছে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। আমি যেই একটা পা কোন মতে সিঁড়িতে রেখেছি, টম জিমকে নির্দেশ দিল, বেলুনটাকে ওপরে ওঠানোর জন্যে। কিন্তু জিমের মাথার গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। ও বললো, কী ভাবে ওপরে ওঠাতে হয় তা ভুলে গেছে। কাজেই টম দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো, আর আমাকেও উঠতে বললো।

সিংহটা লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে আর ভীষন গর্জন করছে। ভয়ে আমার পা-দুটো কাঁপতে লাগলো। আমি একটা পা সিঁড়িতে রেখে সেটা আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইলাম।

এসময় টম বেলুন জাহাজের ওপরে উঠে পড়ে বেলুনটাকে ওপরে ওঠাতে শুরু করলো, তারপর সিঁড়িটা যখন মাটি থেকে দশ-বারো ফুট ওপরে উঠে গেল, তখন বেলুনটাকে থামিয়ে দিল।

সিংহটা এসময় ঝড়ের গতিতে দৌড়তে দৌড়তে ঠিক আমার নীচে এসে তর্জন-গর্জন স্বরু করে দিলো! সিঁড়িটা ধরার জন্যে লাফাতে লাগলো! কিন্তু পারলো না, আমার মনে হলো একটুর জন্যে সে সিঁড়িটা ছুঁতে পারছে না। তার থাবা থেকে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে নিঃসন্দেহে ভাগ্যের ব্যাপার! ভাগ্যকে ধন্যবাদ! কিন্তু আমি এখন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলে রয়েছি এই সিঁড়ির ওপর! অসহায় অবস্থায় সিঁড়িতে ঝুলছি! ওপরে ওঠার মতন শক্তি নেই আমার! সত্যিই সঙ্গীন অবস্থা আমার! এরকম অবস্থায় কেউ যেন কোনো দিন না পড়ে!

টম আমাকে বললো, সিঁড়িটাকে শক্ত করে ধরে থাকার জন্যে। কেন না, সিংহকে পিছনে রেখে আমাকে সে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, বেলুনটা এখন যে উঁচুতে আছে, ও যেন এর চেয়ে বেশী উঁচুতে

এটাকে না তোলে, তাহলে আমি ধরে থাকতে পারবো। আরো উঁচুতে তুললে, আমি নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যাব।



তার জবাবে ও জানালো, 'শক্ত করে ধরে থাকো।' এই বলে বেলুনটাকে সে সজোরে চালিয়ে দিল।

'জোরে যেও না।' চীৎকার করে উঠলাম আমি। 'আমার মাথা ঘুরছে।'

বেলুনটাকে বিদ্যুৎগতিতে চালিয়ে দিয়েছিল টম। এখন ধীরে ধীরে উড়ে চললো বেলুন-জাহাজটা। ভয় তবুও কাটলো না। সিংহটা ঠিক ছুটে আসছে আমাদের পেছন পেছন।

একটু পরেই একসাথে অনেকগুলো সিংহের গর্জন নীচ থেকে আমার কানে এলো! আগের সিংহটার আহ্বান শুনে এরা এসে হাজির হয়েছে! প্রত্যেক দিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে ওরা! অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ কয়েক ডজন সিংহের আবির্ভাব ঘটলো। ওরা সিঁড়িটার দিকে লাফাচ্ছে, পরস্পরের দিকে তেড়ে যাচ্ছে, কামড়াকামড়ি করছে, সৃষ্টি করছে এক ভয়াবহ সন্ত্রাস! আমরাও এগিয়ে চলেছি, ওরাও চলেছে আমাদের তাড়া করে! তার ওপর আরো সিংহ এসে জুটতে লাগলো তাদের সাথে! নীচে রীতিমতন একটা দাঙ্গা বেধে গেল ওদের মধ্যে।

দেখলাম, এভাবে সিংহদের কাছ থেকে আমরা পালাতে পারবো না। আর আমিও চিরকাল সিঁড়িটা ধরে এভাবে ঝুলে থাকতে পারবো না। তাই টম মতলবটা করলো দু-একটা সিংহকে গুলি করে মেরে ফেলবে। অন্য সিংহরা যেই তাদের মৃতদেহটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করবে, অমনি আমাদের সরে পড়তে হবে। টম বেলুনটাকে থামিয়ে বন্দুক ছুঁড়ে একটা সিংহকে খতম করেই প্রায় সিকি মাইল দূরে বেলুনটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। তারপর ও আর জিম মিলে আমাকে ওপরে তুলে নিল। এসময় সেই সিংহের দল ফের আবার দৌড়তে দৌড়তে আমাদের কাছাকাছি এসে পড়লো! কিন্তু বরাত খারাপ পশুরাজদের! আমরা সত্যিই ওদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছি দেখে ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে বসে রইলো।

মরু যাত্রিদল

আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে বেলুনে উঠে না শুয়ে থাকতে পারলাম না। তাই বাক্সের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু এই আগুনে আবহাওয়ার মধ্যে শুয়ে কেউই শক্তি ফিরে পেতে পারে না। তাই টম বেলুনটাকে আরো ওপরে ওঠানোর নির্দেশ দিল। জিম সেই নির্দেশ পালন করলো।

প্রায় মাইল-খানেক ওপরে উঠে আরামদায়ক আবহাওয়া পাওয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আবার শক্তি ফিরে পেলাম।

টম পাটাতনের উপর ম্যাপ ছড়িয়ে দেখতে দেখতে চুপচাপ বসে কিছু একটা

ভাবছিল। হঠাৎ ও লাফিয়ে উঠে বলতে লাগলো, 'আমি হাজার ডলার বাজি ধরে বলতে পারি, আমরা এখন কোথায় রয়েছি। আমরা এখন রয়েছি মহান্ সাহারার উপরে!'

ও এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, যে স্থির থাকতে পারছিল না। আমি ওকে শুধোলাম, 'মহান্ সাহারা কোথায়? ইংলণ্ডে না স্কটল্যাণ্ডে?

'দুটোর একটাতেও নয়। আফ্রিকায়।'

জিমের চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। পলক না ফেলে একদৃষ্টিতে নীচের দিকে হাঁ করে তাকিয়েই রইলো সে। এর কারণ, ওর পূর্ব-পুরুষদের আদিবাস এই আফ্রিকাতেই ছিল। হ্যাঁ আমেরিকার কৃষ্ণকায় মানুষ, যাদের বলা হয় নিগ্রো, তাদের পূর্বপুরুষরা আদিতে ছিল এই মহাদেশ আফ্রিকাতেই। কিন্তু আমি টমের কথাটা অর্ধেকের বেশি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আসলে বিশ্বাস করতে আমার মন সায় দিল না। কেন না, এতদূরে আমরা এসে পড়েছি, এটা ভাবতেই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু টম এখন ওর আবিষ্কারের আনন্দে তুঙ্গে আছে!

ও বললো, একই সাথে সিংহ আর বালির দর্শন পাওয়া মানেই হচ্ছে মহান্ সাহারা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি। ও আরো বলছে, যদি ও একটা জিনিসের কথা মাথায় রাখতো, তাহলে অনেক আগেই ও বলে দিতে পারতো কোথায় এসেছি আমরা।

'আমরা শুধোলাম, 'জিনিসটা কী?'

ও বললো, 'যন্ত্রটাকে বলা হয় ক্রনোমিটার। সমুদ্রযাত্রার গল্প পড়লেই ক্রনোমিটারের কথা জানা যায়। এই ঘড়িটা সব সময় গ্রীনিজের সময় মেনে চলেছে। এই দেখ আমার ঘড়িটা চলছে সেণ্টলুই শহরের সময় মেনে। যখন আমরা সেণ্টলুই ছেড়ে এসেছিলাম, তখন এই ঘড়িতে সময় ছিল বিকেল চারটে, আর গ্রীনিজের ঘড়িতে সময় ছিল রাত দশটা। বছরের এই সময়টায় সূর্য ডোবে প্রায় সাতটায়। কিন্তু গেল সন্ধেয় আমি লক্ষ্য করেছি, সূর্য যখন ডুবে গিয়েছিল, গ্রীনিজের ঘড়িতে তখন সময় ছিল সাড়ে পাঁচটা, আর আমার ঘড়িটায় ছিল সকাল সাড়ে এগারোটা! তাহলে দেখছো, সেণ্ট লুই আর গ্রীনিজের সময় অনুসারে সূর্য এখানে ছ-ঘণ্টা আগে ডোবা-ওঠা করছে! আমরা এতটা পূর্বদিকে এসে পড়েছি। গ্রীনিজে যখন সূর্য ডোবার কথা, তার আধঘণ্টা পরে এখানে সূর্য ডুবছে! তার মানে, আমার সাড়ে চারঘণ্টা সময়ের পার্থক্য এসে গেছি! তাহলে দেখছো, তার মানে, আমার আয়ারল্যাণ্ডের দ্রাঘিমারেখার খুব কাছে

এসে পড়েছি। যদি আমরা সোজাসুজি যেতাম, তাহলে অনেক আগেই সেই দ্রাঘিমারেখা ছুঁতে পারতাম। আমার চলে এসেছি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। আমার মতে আমরা এখন আফ্রিকায় রয়েছি। এই ম্যাপটার দিকে তাকাও। দেখ কী ভাবে আফ্রিকার বাঁকটা পশ্চিমদিকে ঝুঁকে গেছে। ভাব, কত দ্রুতগতিতে আমরা উড়ে এসেছি! যদি আমরা সোজা পুবদিকে যেতাম, এই সময়ের মধ্যে অনেক আগেই ইংলণ্ড ছাড়িয়ে যেতাম। সূর্য যখন মাথার ওপর আসবে, যখন ছায়া আমাদের পায়ের তলায় থাকবে, তখন দেখা যাবে গ্রীনিজের এই ঘড়িটায় সময় বারটার কাছাকাছি। তাতেই বোঝা যাবে,আমরা আফ্রিকাতেই আছি।'

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে জিম নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ও এখন মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, আমার মনে হতেছে, কোথাও তোমার লিচ্চয় ভুল হতেছেন। আমি কোনো কালো রঙের মানুষকে তো দেখতি পেতেছি নে।'

'ওটা কিছু না। মরুভূমিতে তারা বাস করে না। কিন্তু দূরে ওখানে কী দেখা যাচ্ছে? দূরবীনটা আমাকে একবার দাও তো।'

টম অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'একটা কালো দড়ির মতন জিনিস বালি ওপর লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে।'

তবে জিনিসটা যে কী, তা সে আন্দাজ করতে পারলো না।

আমি বললাম, 'বেলুনটা ঠিক কোথায় আছে, রেখাটা দেখেই তা জানার একটা সুযোগ এখন পেয়ে যাব। ম্যাপে যেরকম রেখা আছে, এটাও সেরকম দেখছি! হয়তো কোনো দ্রাঘিমারেখা। নীচে নেমে ওটার নম্বরটা দেখে নিলেই বোঝা যাবে—।'

'ওহ্, ফিন, রেহাই দাও! তোমার মতন মাথামোটা ছেলে আমি একটাও দেখিনি! তুমি কি ভাব পৃথিবীর মাটির ওপর দ্রাঘিমা-রেখা আঁকা আছে না তাতে নম্বর দেওয়া আছে?'

'টম সয়্যার, আমি তো ম্যাপে সেরকমই দেখছি। তুমিও তা ভাল করেই জান। আর এখানেও সেই রেখা দেখা যাচ্ছে। তুমি নিজের চোখেই তা দেখছো!'

'ম্যাপে দ্রাঘিমারেখা আঁকা আছে, তা ঠিক। কিন্তু তা কল্পনা করে নিয়ে আঁকা হয়েছে। মাটির ওপর সেরকম কোনো রেখা সত্যিকারের আঁকা নেই।'

'তাহলে বুঝতে হবে, ম্যাপগুলো ঠিক নয়। ম্যাপের মতন ভুল তথ্যে ভরা জিনিস আমি আর দেখিনি!'

আমার কথা শুনে টম রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলো। আমি এ-জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। জিমও টমের ব্যাখ্যায় গরম হয়ে উঠেছিল। আমরা তর্কে জড়িয়ে

পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় টম দূরবীণটা নামিয়ে রেখে হাততালি দিতে দিতে পাগলের মতন স্বর করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'উট ! উট !'

আমি দূরবীণটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখে লাগিয়ে দেখলাম। জিমও দেখলো। কিন্তু আমি হতাশ হয়ে বলে উঠলাম, 'উট না ঘোড়ার ডিম। ওগুলো মাকড়সা।'

'মরুভূমিতে মাকড়সা ! বুদ্ধু আর কাকে বলে ! মাকড়সা কখনো মিছিল করে যায় ? আমার মনে হয় কি জান, হাক্ ফিন তোমার বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। তুমি কি জান না, আমরা মাটি থেকে প্রায় একমাইল ওপরে রয়েছি, আর যাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা এখান থেকে প্রায় দু-তিন মাইল দূরে রয়েছে ? মাকড়সা ! যত্ত সব ! মাকড়সা কি কখনো একটা গোরুর মতন বড়ো হতে পারে ? ওরা হচ্ছে, একটা মরুযাত্রিদল, মরুভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দলটা প্রায় একমাইল লম্বা।' টম বললো।

আমি বললাম, 'তাহলে নীচে নেমেই দেখা যাক। যতক্ষণ নিজের চোখে না দেখছি, ততক্ষণ বিশ্বাস করতে পারবো না।'

টম বললো, 'বহুৎ আচ্ছা, তাহলে নীচে নামা যাক।'

নীচে গরম আবহাওয়ায় নেমে আসতেই আমরা দেখলাম, সত্যিই ওগুলো উট। ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে তারা। অতি লম্বা তাদের লাইন। যেন শেষ নেই তার ! উটের পিঠে মালের পেটি বাঁধা। কয়েকশো মানুষ সাদা লম্বা আলখাল্লা পরে এগিয়ে চলেছে উটগুলোর সাথে। শালের মতন কাপড় দিয়ে তাদের মাথা বাঁধা, কাপড়গুলো ঝুলে পড়ছে। কিছু লোকের কাছে রয়েছে লম্বা বন্দুক, কিছু লোকের কাছে তা নেই। কিছু লোক চলেছে উটে চড়ে, কিছু লোক চলেছে পায়ে হেঁটে। আবহাওয়া ভীষণ খারাপ। সবই যেন ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে, এত গরম ! কী আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে তারা ! আমরা তাদের মাথার ওপর, প্রায় একশো গজ উঁচুতে নেমে থেমে থাকলাম।

আমাদের দেখেই মরুযাত্রীরা চিৎকার করে উঠলো। কিছু লোক উপুড় হয়ে বালির ওপর শুয়ে পড়লো। কিছু লোক আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। বাকি লোকেরা যে যেদিকে পারলো পালাতে শুরু করলো। উটগুলোও ছুটে পালাতে লাগলো। আসলে বেলুনটা দেখেই তারা ভয় পেয়ে গেছে, তাই এরকম করতো লাগলো।

আমরা দেখলাম, আমাদের উপস্থিতি ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তাই আমরা প্রায় মাইলখানেক ওপরে উঠে এলাম। এখানে বাতাস ঠাণ্ডা। এখান থেকে

আমরা ওদের ওপর নজর রাখলাম। ওদের আবার একসাথে হতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগলো। ওরা আবার সার বেঁধে, মিছিল করে এগিয়ে চললো, চলার পথে। দূরবীণ দিয়ে দেখলাম, চলতে চলতে ওরা মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে।

দূরবীণে চোখ রেখে আমরা হঠাৎ দেখি, একটা লোক একটা বালির পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হয়তো সে মরুযাত্রীদের দেখছে, কিংবা আমাদেরও দেখতে পারে! মরুযাত্রীরা যেই তার কাছাকাছি চলে এলো, অমনি সে সন্তর্পণে সরে পড়লো! আসলে সে তার দলের লোকেদের কাছে চলে গেল। এখান থেকে আমাদের সেরকমই মনে হলো। কেন না, একটু দূরে ঘোড়ার মতন কিছু জন্তু আর মানুষের মতন কিছু প্রাণীকে আমরা দেখতে পেলাম। ঐ লোকেরা দল বেঁধে হাতে বন্দুক আর বল্লম নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে মরুযাত্রীদের দিকে ছুটে এলো। বোঝা গেল, এরা মরু-ডাকাত!

মরুযাত্রীদের সাথে মরুডাকাতদের লড়াই বেধে গেল। কাউকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। গুলির আওয়াজে, আর ধোঁয়ায় জায়গাটা ভয়াবহ রূপ নিল, লড়ায়ের দৃশ্যটা পরিস্কারভাবে দেখাই যাচ্ছিল না! অবিশ্যি ধোঁয়ার জন্যে দৃশ্যটা আমাদের পক্ষে যে ভালভাবে দেখা সম্ভবপর হয়ে উঠল না, এটুকুই সান্ত্বনা! এক রক্তক্ষয়ী তুমুল লড়াই চলছে, উত্তপ্ত সাহারার বুকে! প্রায় ছশো লোক এই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে! একটু পরেই তারা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে হাতাহাতি লড়াই সুরু করলো! একেবারে মরণপণ লড়াই।

ধোঁয়া যখন একটু সরে গেল, তখন দেখলাম, নিহত আহত মানুষে জায়গাটা ভরে গেছে। এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে উট! সেগুলোও নিহত কিংবা আহত। অন্য উটগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে দিগ্-বিদিকে!

অবশেষে ডাকাতরা দেখলো, তারা এই যুদ্ধে জিততে পারবে না। তাদের সর্দার চিৎকার করে একটা সংকেত জানালো। সংকেত পেয়েই দলের লোকেরা বালির ওপর দিয়ে ছুটে পালালো। সবশেষে যে-ডাকাতটা পালালো, সে একজন মায়ের কোল থেকে একটা শিশুকে কেড়ে নিয়ে ঘোড়ায় করে ছুট লাগালো। স্ত্রীলোকটি শিশুটাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে মিনতি জানাতে জানাতে প্রাণপণে তার পেছন পেছন ছুটে চললো। অনেক দূর যাওয়ার পর স্ত্রীলোকটি দেখলো, সে ডাকাতটার অনেক পেছন পড়ে গেছে। ছুটে আর লাভ নেই ভেবে কাঁদতে কাঁদতে বালির উপর আছড়ে পড়ে গেল। হাত দিয়ে বালি তুলে সে মুখে ঘষতে লাগলো। মায়ের প্রাণ তো। সন্তান হারিয়ে পাগল হয়ে

গেছে সে ! টম এসময় নরপশুটার দিকে বেলুনটা চালিয়ে দিল। দ্রুতগতিতে আমরা নীচে নেমে এসে তাকে আচমকা লাঠি দিয়ে একটা গুঁতো মারতেই জিনের ওপর থেকে নীচে পড়ে গেল সে। বাচ্চাটাও পড়ে গেল সেইসাথে। লোকটা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। বাচ্চাটার কোনো আঘাত লাগেনি। চিৎ হয়ে পড়ে বালির মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছিলো বাচ্চাটা, কিন্তু উপুড় হতে পারছিলো না। লোকটা ইতিমধ্যে তার ঘোড়াটা ধরার জন্যে ছুটতে সুরু করেছে। আমরা এসময় প্রায় চারশো গজ ওপরে উঠে আসায় সে আর আমাদের দেখতে পেলো না। বুঝতেও পারলো না, কে তাকে আঘাত করলো ! আমরা ভাবলাম, স্ত্রীলোকটি হয়ত ছুটে এসে তার বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেবে। কিন্তু সে এলো না। আমরা দূরবীণ দিয়ে দেখলাম, সে হাঁটুতে মাথা রেখে চুপ করে বসে আছে। এরমধ্যে যা ঘটে গেল, তা সে দেখতেই পায় নি। সে ধরেই নিয়েছিল, তার বাচ্চাটাকে নিয়ে নরপশুটা হাওয়া হয়ে গেছে। বাচ্চাটাকে সে আর ফিরে পাবে না কোনো দিন-ও ! তার দল থেকে সে প্রায় আধমাইল দূরে চলে এসেছিল। আর বাচ্চাটা ছিল তার থেকে আরও সিকিমাইল দূরে। আমরা নীচে নেমে তাহলে বাচ্চাটাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি। মরুযাত্রীরা এ সময় আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ তারা এসময় আহতদের নিয়ে বহুক্ষণ ব্যস্ত থাকবে। যদি আমরা বাচ্চাটা তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিই, সেটা একটা মানবিক কাজ হবে।

আমরা নীচে এলাম। জিম সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নেমে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ফিরে এলো। বাচ্চাটা ছিল নাদুস-নুদুস, সুন্দর। আমরা তার মায়ের কাছে উড়ে গেলাম। বেলুনটাকে একটু তফাতে থামালাম। জিম বাচ্চাটাকে নিয়ে তার মাকে দিতে গেল। যখন সে খুবই কাছে এগিয়ে গেলো, বাচ্চাটা তখন তার মাকে দেখে কেঁদে উঠলো। স্ত্রীলোকটি কান্না শুনে ছুটে এলো। তার আনন্দ তখন দেখে কে ! জিমের কাছ থেকে বাচ্চাটাকে সে প্রায় ছিনিয়ে নিল। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো। নাচাতে লাগলো। জিমকেও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো। নিজের গলা থেকে একটা সোনার হার খুলে নিয়ে জিমের গলায় পরিয়ে দিল সে। আনন্দে পাগল হওয়া বুঝি একেই বলে ! মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পারায় আমরাও খুব আনন্দ পেলাম !

এরপর জিম সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই আমরা ওপর-আকাশে উঠে এলাম, এক মিনিটের মধ্যে। স্ত্রীলোকটি মাথা পেছন দিকে বেঁকিয়ে সোজা

ওপর দিকে তাকিয়ে রইলো। বেলুনটাকে দেখছে সে। বাচ্চাটা তার গলাটা জড়িয়ে ধরে আছে। যতক্ষণ না আমরা তার চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে এলাম, ততক্ষণ স্ত্রীলোকটি সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো ! বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে। সে !

মরু পতঙ্গের প্রতি টমের শ্রদ্ধা

'ঠিক দুপুর !' চেঁচিয়ে উঠলো টম।

সত্যিই এখন দুপুর। ওর ছায়া লুটিয়ে পড়েছে ওর পায়ের তলায়। আমরা দেখলাম এ সময় গ্রীনিজের ঘড়িতে সময় প্রায় বারোটা। স্থানীয় সময়ের সাথে গ্রীনিজের সময়ের পার্থক্য বিশেষ নেই বলে টম জানালো, আমাদের সোজা উত্তরে হচ্ছে লণ্ডনের অবস্থান। এই জায়গাটার আবহাওয়া, বালি আর উট দেখে ও ধরে নিল লণ্ডন এখান থেকে উত্তরে, বহু দূরে। আন্দাজ করলো, নিউইয়র্ক থেকে মেক্সিকোর দূরত্ব যতটা, এখান থেকে লণ্ডনের দূরত্বও প্রায় ততটা।

আমি মন্তব্য করলাম, 'বুনো পায়রা প্রভৃতি কয়েকটা পাখি আর রেলগাড়ি যদি না থাকতো, বেলুনটা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী বস্তু হতে পারতো।'

টম জানালো, 'ইংলণ্ডের রেলপথের বিবরণ ও পড়েছে। রেলগাড়ি ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল গতিতে চলে, কোনো পাখি এত জোরে যেতে পারে না। পারে একমাত্তর ফ্লী (ডানাহীন রক্তচোষা মাছি জাতীয় ক্ষুদ্রপতঙ্গ)।

'ফ্লী ! কিছুতেই তা হতি পারে না। তবে, মাস্টার টম, আমার মনে হতিছে পাখিও হয়তো সব চেয়ে জোরে যাতি পারে না।' বললো জিম।

'পাখিও পারে না, ফ্লী-ও পারে না, তাহলে পারেটা কে শুনি ?'

'আমি সঠিক জানিনে, মাস্টার টম। তবে এটা কইতে পারি, সেটা হয়তো কোনো জানোয়ার হতি পারে। না, তাও না। জন্তুর মতন অত বড়ো সে হবে না। হ্যাঁ, তবে ছারপোকা হতি পারে।'

'ছারপোকা তো হতেই পারে না। আচ্ছা বলে যা। সেকেণ্ড পজিসনে কে ?'

'সেকেণ্ড পজিসনে পাখি। তবে একটা ফ্লী কিছুতেই হতি পারে না।'

'ফ্লী হতে পারে না ? ব্যাপারটা তাহলে তোকে বুঝিয়ে বলছি। বল দেখি, দূরত্ব কাকে বলে ?'

'কেন, মাইল। অনেক মাইল মিশেমিশে অনেক দূরত্ব হয়। সবাই একথা জানে।'

'মানুষ কি অনেক মাইল হাঁটতে পারে ?'

'হ্যাঁ, তা পারে বটে।'

'একটা রেলগাড়ি যদ্দূরে যেতে পারে, সে কি অদ্দূর যেতে পারে ?'

'সময় দিলেই যাতি পারে !'

'একটা ফ্লী কি পারবে অদ্দূর যেতে ?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, তাকে—তাকে যদি অনেক দিন সময় দিতি পার, সে-ও তালি পারবে।'

'তাহলে দেখছিস শুধু দূরত্ব দিয়ে গতিবেগ বোঝা যায় না, একটা বিশেষ দূরত্ব যেতে গেলে যে-সময় লাগে, তা দিয়ে গতিবেগ বেগ বের করতে হয়। তাই না ?'

'তা হতি পারে। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করতি পারতেছি নে, মাস্টার টম।

'আসলে এটা হচ্ছে অনুগতি, কোন জিনিসের আকার দিয়ে তার গতিবেগ মাপতে হয়। তাহলে দেখবি, একটা ফ্লীর কাছে কোথায় লাগে তোর পাখি, মানুষ কিংবা রেলগাড়ি! সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষ ঘণ্টার দশ মাইলের বেশি দৌড়োতে পারে না। এই সময়ের মধ্যে তার নিজের দৈর্ঘ্যের দশহাজার গুণের বেশি ছোটা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অথচ সব বইতেই ফ্লী নিয়ে এই লেখা পাবি, যে একটা সাধারণ থার্ডক্লাস ফ্লীও একলাফে তার দৈর্ঘের দেড়শোগুণ দূরত্ব পার হতে পারে! সে সেকেণ্ডে পাঁচটা করে লাফ দিতে পারে।'

টমের কথা শুনে জিম হতভম্ব হয়ে পড়লো। আমারও তদাবস্থা।

জিম শুধোলো, 'মাস্টার টম, তুমি গুল দিচ্ছ না তো ?'

'না গুল না। যা বলছি, তার শতকরা একশো ভাগ খাঁটি।'

'তাহলে তো মানুষের উচিত ফ্লীকে সমীহ করে চলা। আগে যদিও তাদের কোনো দিন সমীহ করিনি, এখন মনে হচ্ছে, আমার তা করা উচিত ছিল।'

'নিশ্চয়ই। আকৃতির অনুপাতে তারা পৃথিবীর যে-কোনো প্রাণীর থেকে জ্ঞানবুদ্ধিতে বড়ো। একটা লোক তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে, আর তারা তা যে-কোনো প্রাণীর থেকে তাড়াতাড়ি শিখতে পারে! ছোট ছোট মোট নিয়ে তারা এদিকে, ওদিকে, সবদিকে—যেদিকে যাওয়ার নির্দেশ থাকে, সেদিকে যেতে পারে। তারা মার্চ করতে পারে, ড্রিল করতে পারে। সৈনিকদের মতন তারা শৃঙ্খলাপরায়ণ। তারা নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে জানে। মনে কর, তুই একটা ফ্লীকে মানুষের মতন বড়ো করে তুললি, তাহলে তার বুদ্ধিও সে-তুলনায় বেড়ে যাবে। এটা সম্ভব হলে মানুষের ঠাঁই কোথায় হবে বলতে পারিস ? তখন ফ্লী হবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ! ফ্লীর বিজলির

গতিকে যেমন কেউ রুখতে পারে না, তিমনি ফ্লীর রাষ্ট্রপতি হওয়াটাকেও তখন কেউ রুখতে পারবে না।'

'মাস্টার টম, আমি সত্যিই জানতাম না, ফ্লী এত সেরা প্রাণী। সত্যি বলছি, আমার কোনো ধারনাই ছিল না।'

'আকৃতির অনুপাতে ফ্লী মানুষ বা পশুর চেয়ে আরো অনেক বিষয়ে বড়ো। তারা সবার চেয়ে মজাদার। মানুষ পিঁপড়ের শক্তি, হাতির শক্তি, রেলইঞ্জিনের শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। কিন্তু ফ্লীর সম্বন্ধে কিছুই বলে না। একটা ফ্লী তার নিজের ওজনের দু-তিনশো গুণ বেশি বোঝা ওঠাতে পারে। এই হিসেবে কোনো প্রাণীই তার ধারেকাছে আসে না। তার ওপর তার অসাধারণ ধারণাশক্তি আছে, যার দরুন তোরা তাকে বোকা বানাতে পারবি নে। তার সহজাত প্রবৃত্তি, কিংবা বিচারবুদ্ধি, কিংবা যাই বল না কেন, তা খুবই নির্ভুল আর পরিচ্ছন্ন। কখনো সে ভুল করে না। লোকে বলে, মানুষের সাথে ফ্লীর সাদৃশ্য আছে। আসলে তা নয়। এমন অনেক মানুষ আছে, কখনো ফ্লী তাদের কাছ ঘেঁসে না। আমি হচ্ছি এই দলে। জীবনে আজ পর্যন্ত একটা ফ্লীও আমার গায়ের ওপর বসেনি।'

'মাস্টার টম, হাসালে তুমি!' বললো জিম।

'হাসির কথা না, ঠিকই বলছি।'

'আমি কখনো এরকম কথা শুনি নি।'

টমের কথা জিমও বিশ্বাস করতে পারলো না, আমিও পারলাম না। তাই আমরা নীচে বালির ওপর নেমে এলাম, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। টম ঠিকই বলেছিল। আমার আর জিমের দিকে হাজার হাজার ফ্লী ছুটে এলো। কিন্তু টমের দিকে একটাও গেল না। ব্যাপারটার কোনো ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু এরকমই ঘটলো। ও বললো, ওর বেলায় সব সময়েই এরকম ঘটে। যেখানে লক্ষ লক্ষ ফ্লী ঝাঁক বেঁধে থাকে, ও যদি সেখানে যায়, একটাও ওকে স্পর্শ করে না, কিংবা জ্বালাতন করে না।

আমরা ওপর আকাশে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় উঠে গেলাম, ফ্লীগুলোকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলার জন্যে। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে নেমে এলাম নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়। তারপর আবার আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। এখন আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল। গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই আমরা এরকম শ্লথগতিতে চলেছি। এর কারণ, মরুভূমির দীর্ঘ পথটা ছিল ভাবগম্ভীর, শান্তিপূর্ণ। আমাদের ভেতর যে উত্তেজনা ছিল, তার ইতিমধ্যেই উপশম

ঘটেছিল। আমরা বেশি বেশি করে নিজেদের সুখী, পরিতৃপ্ত মনে করছিলাম। মরুভূমিটা আমাদের যত বেশি পছন্দ হচ্ছিল, তত বেশি করে তাকে আমরা ভালোবাসছিলাম। তাই আমরা বেলুনের চলার গতি কমিয়ে দিয়েছিলাম। আমার নিজের কথা বলতে গেলে এটাই বলতে হয়, সময়টা আমার খুবই সুন্দর ভাবে কাটছিল। অফুরন্ত সময়ের কিছুটা খরচ করছিলাম চোখে দূরবীণ লাগিয়ে নানারকম দৃশ্য দেখে। কিছুটা সময় খরচ করছিলাম লকারের ওপর শুয়ে বসে বই পড়ে। দিনের বাকি সময়টা খরচ করছিলাম দিবানিদ্রা দিয়ে।

বেলুনে এখন আমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। কোনো ভয়-ভীতিও ছিল না। এটা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন চাইছিল না। বেলুনটা আমাদের বাড়ির মতন সহজ হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, যেন এখানেই আমি জন্মেছি, এখানেই আমি বড়ো হয়েছি! জিম আর টমও একইরকম বলছিল!

বাড়িতে যখন ছিলাম, আমার চারপাশে অপছন্দের লোকেরা শুধু ঘুরঘুর করতো। তারা আমাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সবসময় ভৎসনা করতো। দোষ খুঁজে বের করতো, ঝামেলা আর গোলমাল পাকাতো। জ্বালাতন করতো, পেছনে লেগে থাকতো। তারা আমাকে দিয়ে এটা ওটা করাতো। যেসব কাজ আমি করতে চাইতাম না, সেসব কাজই তারা আমার উপর চাপতো বেশি করে। সর্বক্ষণ তারা আমার জীবনকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলতো। কিন্তু এখন এই খোলা আকাশে উঠে জীবন সম্বন্ধে আমার অনুভূতি পাল্টে গেল। জীবন যে এত সুন্দর এর আগে কখনো আমি এমন করে বুঝতে পারি নি!

আকাশ এখানে শান্ত, উজ্জ্বল, মনোরম। বেলুনে রয়েছে প্রচুর রকমের অফুরন্ত খাবার-দাবার। ঘুমের জন্যে সময়ের অভাব নেই এখানে। যত খুশি খাও, ঘুমোও। আর খুশি মতো আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস চারপাশে দেখ। দু-চোখ ভরে চেয়ে থাক। কেউ জ্বালাতন করবে না, বাধা দেবে না। উপদেশ দেওয়ার লোকও এখানে নেই। সব সময় শুধু ছুটি আর ছুটি! এই কারণেই সভ্যতার ঐ বাঁধা জীবনের ভিড়ে ঝটপট ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আপাতত আমার নেই!

মনে হয় আমাদের এখনকার সভ্যতার সব চেয়ে খারাপ অবদান দুটো: চিঠি আর খবরের কাগজ। কেউ একটা চিঠি পেলেই তাতে খারাপ কিছু খবর আছে ভেবে তার বুকের ভেতরটা ধড়পড় করে ওঠে। খারাপ মানে দুঃসংবাদ। হ্যাঁ, চিঠি মানেই মনে হয় দুঃসংবাদ! পড়লেই বেজায় মন খারাপ হয়ে যায়! খবরের কাগজও তাই। একে বলা চলে দুঃসংবাদপত্র! দুনিয়ার মানুষের যত দুঃসংবাদ ছাপা হয় এতে, আর তা পড়ে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, ভারি হয়ে পড়ে!

তাই আমি খবরের কাগজ আর চিঠিচুটোকেই বিষম ঘেন্না করি। যদি আমার উপায় থাকতো, একজনের দুঃখকে কিছুতেই অন্যদের ওপর চাপাতে দিতাম না। পৃথিবীর যে-অংশকে আমরা চিনি নে সে-অংশের দুঃখের খবর জেনে আমাদের কী লাভ!

বেলুনে চিঠি বা খবরের কাগজের কোনো রকম দৌরাত্ম্য নেই! কাজেই আমার মতে জগতের সব চেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে এটাই। স্বর্গসুখ বলতে যা বোঝায়, তা শুধু আমার মতে এখানেই আছে!

রাত্তিরের খানা খেয়ে নিলাম আমরা। এরকম সুন্দর রাত আমি এর আগে কখনো দেখিনি! চাঁদের আলোয় চারদিক দিনের বেলার মতন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! নরম, মিষ্টি আলোয় ঝলমল করছে চারধার! নীচে তাকিয়ে একবার একটা নিঃসঙ্গ সিংহকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম! সারা পৃথিবীতে সে যেন একা, যেন কেউ নেই তার! বালির ওপর তার ছায়াটা এমন ভাবে পড়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে সেটা যেন কালিভর্তি একটা ডোবা! চাঁদের আলোয় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এরকম!

আমরা চিৎ হয়ে শুয়ে গল্প করছিলাম। এখনই আমাদের ঘুমোতে মন চাইছিল না। এরকম রাতকেই বুঝি বলে চন্দ্রধৌত রজনী! টম আবার ঠিক এসময়টায় আরব্য-রজনীর প্রসঙ্গ তুলে বসলো!

টম বললো, আমরা 'আরব্য রজনী'-র একটা কাহিনীর পটভূমিকার জায়গাটায় এসে পড়েছি! এই জায়গাটাই মনে হচ্ছে সেই বইটার একটা অদ্ভুত অসমাপ্ত কাহিনীর পটভূমি। একথা শুনে আমরা নীচের দিকে তাকালাম। কিন্তু একটা চমৎকার মজাদার গল্পের পটভূমি হওয়ার মতন জায়গা বলে এটাকে আমার মনে হলো না।

টম বলতে শুরু করল, এটা একটা উট-চালকের গল্প। তার উটটা গেছে হারিয়ে। উট খুঁজতে খুঁজতে সে মরুভূমিতে এসে হাজির হলো। একটা লোককে দেখতে পেয়ে সে শুধোলো, 'একটা দলছুট উটকে তুমি আজ দেখেছো কি?'

লোকটা উত্তরে প্রশ্ন করলো, 'উটটার বাঁ চোখটা কি কানা?'

উটচালক বললো, 'হ্যাঁ।'

'তার ওপরের পাটির একটা দাঁত কি পড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তার পেছনের একটা পা কি খোঁড়া?'

'হ্যাঁ।'

'তার পিঠের একধারে জোয়ারের বোঝা, অন্য ধারে কি মধুর ভাণ্ড ছিল ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আর বেশি কথা বলার দরকার নেই। সেটাই আমার উট। দয়া করে তাড়াতাড়ি বল, তাকে কখন কোথায় দেখেছো তুমি ?'

'আমি তাকে আদৌ দেখিনি।' লোকটা জানালো।

'তুমি তাকে আদৌ দেখ নি ? তাহলে অত নিখুঁত ভাবে তার বর্ণনা দিলে কেমন করে ?'

'কিভাবে বর্ণনা দিলাম ? শোনো তাহলে, কোনো লোক যদি তার চোখদুটোকে ঠিকমতো কাজে লাগায় তবে, সবকিছুর মানে তার জানা হয়ে যায়। কিন্তু আসলে বেশির ভাগ লোকই চোখ থাকা সত্ত্বেও খুঁটিয়ে দেখতে জানে না। আমি উটটার পায়ের ছাপ দেখেই বুঝেছিলাম, সেটা দলছুট, সাথীহারা। তার পেছনের একটা পা যে খোঁড়া এটা জেনেছিলাম তার ওই পায়ের ছাপটা দেখে। ওটার ওপর সেটা ভর কম দিয়ে হাঁটছিল। তার বাঁ চোখটা ছিল, কানা কেন না পথ চলতে চলতে সে শুধু রাস্তার ডানদিকের কাঁটা ঝোপ খেয়েছিল। তার ওপরের পাটির একটা দাঁত পড়ে গিয়েছিল এটা জেনেছিলাম ঝোপের গায়ে তার দাঁতের ছাপ দেখে। পিঁপড়েরাই আমাকে বলে দিয়েছে, তার পিঠের একধারে বোঝাই করা ছিল জোয়ারের দানা। আর মাছিরা আমাকে বলে দিয়েছে, অন্যধারে মধু ছিল, টুপিয়ে টুপিয়ে মাটির ওপর তা পড়েছিল। কাজেই তোমার উটটাকে আমি চোখে না দেখলেও তার বিবরণ আমার জানা হয়ে গেছে।'

জিম বললো, 'উফ্, মাস্টার টম। তুমি যা বল্লে, গপ্পটা ভীষণ ভাল, বেজায় মজাদার।'

'গল্পটা এখানেই শেষ', বললো টম।

'আর নেই ?' জিম অবাক হয়ে বললো। 'উটটার তাহলে কি হলো ?'

'আমি তা জানি নে।'

'মাস্টার টম, গল্পে কি তা নেই ?'

'না।'

'জিম মহা ধাঁধায় পড়লো। এক মিনিট পরে ও বলে উঠলো, 'তাহলি বলতি হয়, গল্পটা একেবারে মাঠে মারা গিয়েছে। ঘটনাটা যেইখানে চমৎকার হয়ে উঠেছেন সেখানেই সেটা শেষ হয়ে গেলো। এইরকম গল্প বলার কোনো মানে হয় না। উটচালক তার উটটাকে ফিরে পেয়েছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে তোমার কোনো খোঁজখবর বা ধারনা আছে ?'

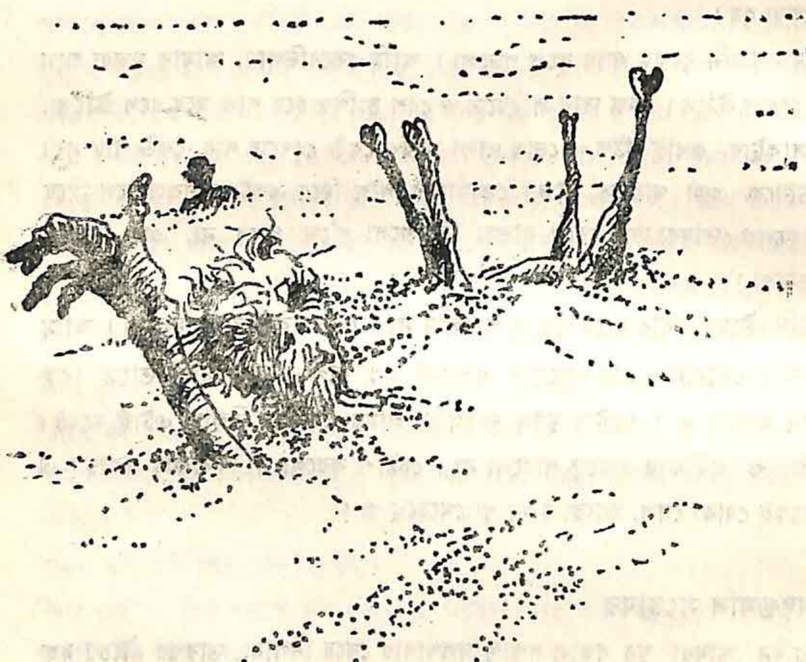
'না, আমার তা নেই।'

আমারও মনে হলো, গল্পটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওটাকে ও-ভাবে জবাই করা উচিত হয় নি। কিন্তু জিমের প্রশ্নে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে ভেবে ওকে আর কিছু বললাম না। কোনো কোনঠাসা লোককে আঘাত করা উচিত নয়।
টম এসময় আমার দিকে চটপট ঘুরে শুধোলো, 'হাক্ ফিন, গল্পটা শুনে তোমার কী মনে হলো ?'
আমার মনের অবস্থা জিমেরই মতন, আমি এখন আর তা প্রকাশ না করে থাকতে পারলাম না। মাঝামাঝি জায়গা পর্যন্ত টেনে এনে কোনো গল্পকে যদি থামিয়ে দেওয়া যায়, তবে তা গল্প হয় না, পণ্ডশ্রম হয়। শ্রোতাদের বিষম কষ্ট দেওয়া হয়।
টমের থুতনি বুকের ওপর ঝুলে পড়লো। আমি ভেবেছিলাম, আমার মন্তব্য শুনে ও ক্ষেপে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে ও বেশ দুঃখিত হয়ে শান্ত স্বরে বলে উঠলো, 'লোকটার কথাই ঠিক,—চোখ থাকা সত্ত্বেও কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না। উটটাকে একা থাকতে দাও। তোমাদের পাশ দিয়ে একটা ঘূর্ণিঝড় চলে গিয়ে থাকলেও তোমরা তার রেখে যাওয়া চিহ্নগুলো খুঁজে পাবে না, এত নির্বোধ তোমরা !'
আমি টমের কথার মানে বুঝতে পারলাম না। সেও কিছু বলে দিল না। আমি দেখছি, কোনঠাসা হয়ে পড়লে ও এভাবেই কথা বলে। কিন্তু আমি তাতে কিছু মনে করলাম না। গল্পটার দুর্বল জায়গাটা আমরা দেখিয়ে দিলাম, এটাই যথেষ্ট। এটা ও অস্বীকার করতে পারলো না। চেষ্টাও করলো না অস্বীকার করার ! এ থেকেই বোঝা গেল, আচ্ছা রকম ঘা খেয়েছে ও !

অদৃশ্যমান সরোবর

পরদিন আমরা খুব সকাল সকাল জলখাবার খেয়ে নিলাম, তারপর নীচের দৃশ্য দেখার জন্যে পাটাতনের উপরে যেয়ে বসলাম। আমরা খুব উঁচু দিয়ে উড়ছিলাম না, আবহাওয়া বেশ মনোরম। সূর্যাস্তের পর মরুভূমির আবহাওয়া অতি দ্রুত পালটাতে থাকে। ঠাণ্ডা হতে থাকে বালি, ভোরের দিকে আবহাওয়া এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, রোদ না ওঠা পর্যন্ত বালির ওপর দিয়ে বেশি পথ হাঁটাই যায় না। দেখলাম বেলুনের ছায়াটা নিঃশব্দে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, মরুভূমির সবকিছু তাকিয়ে দেখছিলাম, কোনো কিছু নড়ে ওঠে কিনা, কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা। তার পর আবার বেলুনের ছায়াটা দেখছিলাম। হঠাৎ বেলুনের ঠিক নীচে দেখতে পেলাম কয়েকটি উট ও কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে।

একটুও শব্দ বা নড়াচড়া করছে না তারা। নিঝুম-নিস্তব্ধ চারধার। মনে হলো, উট এবং লোকগুলো, সবাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা টমের চোখেও পড়েছে। আমরা গতি থামিয়ে পিছিয়ে নিয়ে এলাম বেলুনটাকে, তারপর উট আর লোকগুলির কিছুটা ওপরে বেলুনটাকে এনে দাঁড়ালাম। তখুনি আমাদের নজরে এলো, ওরা সবাই মৃত! আমরা কাঁপতে লাগলাম ভয়ে! ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমাদের হাত-পা! কারোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মানুষ যেরকম নীচু গলায় কথা বলে, আমরাও সেভাবে কথা বলতে লাগলাম। আরো কিছুটা নীচে নেমে এলাম আমরা।



টম আর আমি বেলুন থেকে বালির ওপর নেমে পড়লাম, সিঁড়ি বেয়ে। তারপর মৃতদের কাছে চলে গেলাম। পুরুষ, নারী আর শিশুর মৃতদেহ সেগুলো। রোদ্দুরে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল তাদের শরীর। চামরা মাংস কুঁচকে তাদের শরীর এমন কালো আর চামসিটে হয়ে গিয়েছিল, যে সেগুলোকে মমির মতন মনে হচ্ছিল! মমির ছবি আমরা বইতে দেখেছি। তবুও তাদের অবিকল মানুষের মতনই লাগছিল। যেন না খেতে পেয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তারা!

কিছু মানুষ, ও পশুর শরীর আংশিক বালিতে ঢেকে রয়েছে। আবার অনেকেরই শরীর ছিল আঢাকা। বালির স্তর সেখানে পাতলা, তারা যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানটা পাথুরে, শক্ত। তাদের বেশির ভাগ পোশাক-আসাক পচে খুলে গিয়েছিল। একটা কম্বলে হাত রাখলেই সেটা মাকড়সার জালের মতন সঙ্গে



সঙ্গে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। টমের ধারনা, তারা বছরের পর বছর পড়ে আছে সেখানে!

কিছু লোকের পাশে পড়ে আছে মরচে ধরা বন্দুক, পিস্তল কিছু লোকের কাছে তরবারি। সবকটা উটের পিঠে ছিল মালপত্রের বোঝা। সেগুলোর বাঁধন পচে ছিঁড়ে গিয়েছিল। মালগুলো ছড়িয়ে ছিল মাটির ওপর। তরবারিগুলো মৃতদের

কোনো কাজে লাগবে না ভেবে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আমরা একটা তুলে নিলাম। কয়েকটা পিস্তলও কুড়িয়ে নিলাম। একটা চমৎমার কাজকরা ছোট্ট সুন্দর একটা হাতির দাঁতের বাক্স আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সেটাও নিয়ে নিলাম। তারপর আমরা লোকগুলিকে সমাধিস্থ করবো বলে মনস্থ করলাম। কিন্তু তার উপায় ছিল না। কেননা, মাটি বলতে সেখানে ছিল শুধু বালি। বালি দিয়ে মৃতদেহগুলো চাপা দিলে আবার বাতাসে সেগুলো আলাদা হয়ে যাবে। কাজেই ও মতলব ছাড়তে হলো আমাদের।

আমরা বেলুনে উঠে আবার ভেসে চললাম আকাশপথে। একটু বাদেই মরুভূমির সেই কালো ফুটকিগুলো আমাদের দৃষ্টি থেকে সরে গেল। ওই দুর্ভাগা মানুষগুলোকে আর কখনো দেখতে পাব না আমরা! কিভাবে মানুষ-গুলো ওখানে এসেছিল, কিভাবে তারা মারা গিয়েছিল, তা নিয়ে আমরা অনেক মাথা ঘামালাম, কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পেলাম না। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, মানুষগুলো পথ হারিয়ে অবিরাম ঘুরে বেড়িয়েছিল। তারপর খাদ্য পানীয়ের অভাবে তারা একদিন মারা গিয়েছিল। কিন্তু টম জানালো, তা নয়। কারন বন্য পশু কিংবা শকুনরা তাদের ছোঁয়নি। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম, এ নিয়ে আমরা আর মাথা ঘামাবো না। কারণ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে আমরা মনের জোর হারিয়ে ফেলছিলাম।

এবার আমরা বাক্সটা খুলে ফেললাম। সেটা গয়নাগাঁটিতে ভর্তি ছিল। তার ওপরে ছিল মহিলাদের মুখঢাকা পর্দার মতন একটুকরো আচ্ছাদন। সোনার সুতোয় নানা নক্সার কারুকার্য করা ছিল সেটা! প্রাচ্যদেশীয় এরকম আশ্চর্য বস্তু আমরা আগে কখনো দেখি নি!

আমরা আবার ফিরে গিয়ে মৃতদের জিনিস, তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু জানালো, তা করাটা ঠিক হবে না। কেন না, এই দেশটা হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক সব ডাকাতে ভর্তি। তারা একদিন এটা সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে, তখন আমাদের ওপর পাপ এসে বর্তাবে। কাজেই আমরা পেছনে না ফিরে সামনে এগিয়ে চললাম।

নীচে নেমে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় দুঘণ্টা থাকতে হয়েছিল আমাদের। ফলে বেলুনে উঠে আসতেই আমাদের ভয়ানক জলতেষ্টা পেয়ে গেল। জল গেল ফুরিয়ে, জলের সন্ধানে আমরা সোজা এগিয়ে চললাম পুবদিকে। অবশেষে একটা ছোট্ট মরুদ্যানে জল পেলাম। কিন্তু ভীষণ বিস্বাদ, তেতো। তার ওপর জলটা ভীষণ গরম, মুখে দিলেই মুখ পুড়ে যাবে। জলটা সত্যিই পানের অযোগ্য। এসময়

বিশাল মিসিসিপি নদীর কথা আমার মনে পড়ে গেলো, যার জল পৃথিবীর সেরা পানীয়! আমরা এই জলাশয়টার পাঁকের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যদি তা থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায়, এই আশায়। কিন্তু তাতেও কোনো সুরাহা হলো না!

যতক্ষণ আমরা মৃতলোকগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, ততক্ষণ তেষ্টা অনুভব করিনি। কিন্তু বেলুনে উঠে আসার পর কিছুটা জল পান করার পর যখন দেখলাম আমাদের পানীয় ফুরিয়ে গেছে, তখন আমাদের মনে হলো, আমাদের মতন তৃষ্ণার্ত মানুষ এ-জগতে নেই! পনেরো সেকেণ্ড আগে আমাদের যেরকম তেষ্টা ছিল, এখন যেন তার পঁয়ত্রিশ গুণ তেষ্টা বেড়ে গেল! কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরের মতন করে মুখ খুলে হাঁপাতে ইচ্ছে হলো আমাদের!

টম বললো, চারদিকে চোখ মেলে দেখতে, যদি কোনো দিকে মরুদ্যান চোখে পড়ে! ভাগ্যে কী আছে জানি নে! আমরা হাঁ করে তাকিয়েই রইলাম। চোখে দূরবীন লাগিয়ে চেয়ে রইলাম। হাত লেগে যাচ্ছিল ভীষণ ভাবে! কিন্তু উপায় নেই!

দুঘণ্টা কাটলো, তিনঘণ্টা কাটলো কোথায় মরূদ্যান। আমরা তাকিয়েই রইলাম। শুধু বালি, বালি আর বালি! তাকানো যাচ্ছে না, সূর্যের তেজে ঝলসে যাচ্ছে সেই বালি। একজন তৃষ্ণার্ত ছুটে চলেছে জলের সন্ধানে, কিন্তু সে জানে, জল কোথাও নেই! ছোটা মানেই তৃষ্ণা বাড়ানো! তবু ছুটতে হচ্ছে তাকে! এর চেয়ে বেশী কষ্টকর আর কী হতে পারে! অবশেষে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, জলের আশা ত্যাগ করে শুয়ে পড়লাম পাটাতনের ওপর! এসময় টম চিৎকার করে বলে উঠলো, এই হাক্ ওঠ, ওই যে জল! একটা মস্তবড় টলটলে মরূদ্যান! তার চারপাশে ঝুঁকে রয়েছে রসালো ফলধরা খেঁজুরগাছ। জলের ওপর ছায়া পড়েছে তাদের! দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। অনেক দূরে মরূদ্যানটার অবস্থান। সাত মিনিটে সেখানে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু যতই আমরা এগোই না কেন, দূরত্ব আর কমে না! আমরা সরোবরটার কাছেপিঠেও যেতে পারলাম না! স্বপ্নে যেরকম ঘটে, এখানেও সেরকমই ঘটলো! হ্যাঁ, ঠিক তাই। হঠাৎ সরোবরটা অদৃশ্য হয়ে গেল!

টম চোখদুটো বিস্ফারিত করে বলে উঠলো, 'ওটা একটা মরীচিকা, বুঝলে!'

টম জানালো, মরীচিকা দেখে ও আনন্দিত। আমি কিন্তু এতে আনন্দিত হওয়ার কিছু দেখছি নে। আমি বললাম, 'হতে পারে। ঐ নামে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যা জানতে চাই, তা হচ্ছে সরোবরটার হলো কী? সেটা

কোথায় মিলিয়ে গেল ?'

জিম কাঁপছিল। ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। যদি বেরোতো, নিশ্চয়ই ও আমার প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করতো।

টম বললো, 'সরোবরটার কী হলো ? কেন, তোমরা তো নিজেদের চোখেই দেখলে, ওটা মিলিয়ে গেল।'

'সেতো দেখলাম। কিন্তু কোথায় গেল ?'

টম আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হাক্ ফিন, তুমি আমাকে শুধোচ্ছ ওটা কোথায় গেল ? তুমি কি জান না, মরীচিকা কাকে বলে ?'

'না, আমি জানি নে।'

'মরীচিকা হচ্ছে রৌদ্রতপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত মানুষের কল্পনা। তাছাড়া কিছু নয়।'

টমের কথা শুনে আমি রেগে উঠলাম। বললাম, 'টম সয়্যার, বাজে কথা বলো না ? আমি কি কখনো বড় সরোবর দেখিনি বলতে চাও ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখেছো।'

'তাহলে যেটা দেখলাম, সেটাও একটা সরোবর।'

'কিন্তু আমি বলছি, তুমি সরোবর দেখ নি। কেন না, ওটা তা ছিল না।'

টমের কথায় জিম বিস্মিত হয়ে টমের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। হতাশ স্বরে বলে উঠলো ও, 'মাস্টার টম, এরকম একটা কষ্টকর সময়ে ওরকম উদ্ভট কথা বলো না। আমি এখন যেরকম তোমাকে আর মাষ্টার হাক্ ফিনকে দেখতে পাচ্ছি, তেমনি হ্রদটাকেও দেখতে পেয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'কেন, টমও তো দেখেছে ! প্রথমে ওই তো দেখেছিল। তাহলে এখন অন্য কথা বলছে কেন ?'

'হ্যাঁ, মাস্টার টম, হাক্ ঠিকই বলেছে। তুমি এটা অস্বীকার করতে পার না। আমরা সবাই দেখেছি। এতেই প্রমাণ হয়, ওটা হ্রদ ছিল।'

'প্রমাণ হয় ? কিভাবে প্রমাণ হয় ?'

'কোর্টে যে-ভাবে সাক্ষীর কথা শুনে প্রমাণ হয়; ঠিক সে-ভাবে।' জিম বললো। ও আরো বললো, 'একটা লোক মাতাল হতে পারে বা আধাঘুমন্ত হতে পারে, সে একটা ভুল দেখতে পারে। দুজনেরও কোন সময় ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, যখন তিনজন লোক একটা জিনিস দেখে, মাতালই হোক, আর সুস্থই হোক, তখন তাদের ভুল হয় না।

'ওরকম কথা আমি জানি নে। পৃথিবীর চল্লিশ হাজার মিলিয়ন মানুষ প্রতিদিন দেখছে সূর্য আকাশের একদিক থেকে আরেকদিকে সরে যাচ্ছে। এতে কি প্রমাণ

হয় সূর্য তাই করছে ?'

'নিশ্চয়ই তাই করছে। এটা কি একটা প্রমাণ করার মতো কথা। যারই সামান্য একটু জ্ঞানগম্যি আছে, সে এটা নিয়ে কোনসময় সন্দেহ প্রকাশ করবে না। এখন যেমন করে সূর্য চলে বেড়াচ্ছে, এমনি করে সে সব সময় চলে বেড়িয়েছে এবং বেড়াবে।'

টম আমার দিকে ঘুরে শুধোলো, 'হাক্ ফিন, তুমি এবিষয়ে কী বল ? সূর্য কি একজায়গায় স্থির হয়ে নেই ?'

'টম সয়্যার, এরকম উদ্ভট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কারণ কী ? অন্ধ না হলে প্রত্যেকেই জানে, সূর্য একজায়গায় স্থির হয়ে থাকে না।' বললাম আমি।

'এখানে আমার কথার সমর্থক নেই দেখতে পাচ্ছি ! তিন-চারশো বছর আগে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তা-ব্যক্তি যা প্রমাণ করে গেছেন, উল্লুকদুটো তা জানে না দেখছি !'

আমি টমকে জানিয়ে দিলাম, এভাবে এঁড়ে-তর্ক করা উচিত হচ্ছে না। বললাম, 'গালাগালি করে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বুঝলে টম সয়্যার।'

'আহা রে, কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য ! 'ওই যে, হ্রদটা আবার দেখা যাচ্ছে !' জিম চেঁচিয়ে উঠলো আনন্দে। 'মাস্টার টম, তুমি এখন কী বলবে ?'

হ্যাঁ, হ্রদটাকে আবার দেখা গেল ! মরুভূমির একপাশে, একটু দূরে ! সেই একই রকম হ্রদ ! অবিকল একই রকম !

আমি বলে উঠলাম, 'টম সয়্যার, আশাকরি এখন তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো !'

কিন্তু ও সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, সন্তুষ্ট হয়েছি। হ্রদট্রদ কিস্সু নেই, স্রেফ ধোঁকাবাজি, চোখের ভুল।'

জিম বললো, 'মাস্টার টম, ও-ভাবে কথা বলো না। শুনলেও খারাপ লাগে। একে ভীষণ গরম, তার ওপর তৃষ্ণার্ত, তোমার মাথার ঠিক নেই ! ওহ্, কিন্তু ওটা কাছে আসছে না কেন ? আমার যে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে !'

টম বললো, তোকে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। তাহলেই দেখতে পাবি ওটা হ্রদ না। তোর তেষ্টা তখন আরো বেড়ে যাবে !'

আমি বললাম, 'জিম তুমি হ্রদের ওপর থেকে চোখ সরিও না, আমিও সরাবো না।'

'আমি সরাচ্ছি নে।' বললো জিম।

আমরা ঝড়ের বেগে উড়ে চলেছি। মাইলের পর মাইল আমরা ফেলে আসছি পেছনে। কিন্তু এক-ইঞ্চিও সরোবরটার দিকে এগোতে পারছি নে ! এবং হঠাৎ

দেখলাম, সেটা উধাও হয়ে গেল !

জিম টলতে টলতে পড়ে গেল। যখন ওর চৈতন্য ফিরে এলো, মাছের মতন হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, ওটা একটা ভূতের কারসাজী। আর যেন ওটাকে না দেখতে হয়। এই দেখলাম হ্রদ, আবার এই নেই ! হ্রদটা মরা। দুবার দেখেই বুঝে নিয়েছি ওটা একটা ভূত। রাত আসার আগেই আমাদের এখান থেকে সরে পড়া উচিত।'

'ভূত না হে, বাছাধন ! ওটা হচ্ছে কল্পনা। বায়ু, প্রচণ্ড উত্তাপ আর প্রচণ্ড তৃষ্ণা মিলে সৃষ্টি করে এই কল্পনা। এরই নাম মরীচিকা। দেখি, দূরবীণটা দাও তো।' এই বলে দূরবীণটা আমার কাছ থেকে নিয়ে চোখে লাগালো টম। ডানদিকে দেখতে লাগলো ও। তারপর বলে উঠলো, 'একঝাঁক পাখি দেখছি ! সূর্য যে-দিকে ডোবে, অনেকটা সেদিকেই উড়ে চলেছে ওরা ! আমাদের পথের আড়াআড়ি একটা সরলরেখায় চলেছে ওরা। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ? নিশ্চয়ই কোনো আশ্রয়ের সন্ধানে। খাদ্যের খোঁজে, কিংবা জলের খোঁজে, কিংবা দুটোরই খোঁজে। বেলুনটাকে ডানদিকে চালাও।'

আমরা বেলুনের গতি এমন ভাবে কমিয়ে দিলাম, যাতে পাখিগুলোকে ছাড়িয়ে না যাই। আমরা সিকিমাইল দূরত্ব রেখে তাদের পেছন পেছন উড়ে চললাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তাদের অনুসরণ করার পর যখন ভীষণ ভাবে হতাশ হয়ে পড়েছে, যখন তেষ্টা আর সহ্য হচ্ছে না, টম বলে উঠলো, 'তোমাদের যে-কেউ একজন দূরবীণটা নিয়ে দেখতে পার, দূরে পাখিগুলোর সামনে কী আছে।'

জিমই প্রথম সুযোগটা নিল। এক নজর তাকিয়েই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাটাতনের উপর পড়ে গেল। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো 'মাষ্টার টম, ভূতুড়ে হ্রদটাকে আবার দেখা যাচ্ছে ! আমি আর দেখতে চাইনা, ওটা শরীরের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আবার ওটা উধাও হয়ে যাবে ! আর আমিও মরে যাব সেই সাথে ! কেন না, একটা লোক যদি পরপর তিনবার ভূত দেখে, সে আর বাঁচে না !'

জিম আর তাকালো না, খোলের মধ্যে মাথা নীচু করে বসে রইলো। ওর কথা শুনে আমিও বেজায় ভয় পেয়ে গেলাম। কেন না, ভূতদের সম্বন্ধে জিম যা বলেছে, তা সত্যি। কাজেই আমিও ঠিক করলাম, একদম তাকাবো না। আমরা দুজনেই টমকে অনুরোধ করলাম বেলুনটা অন্যদিকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ও তা শুনলো না, উল্টে বলে উঠলো, আমরা নাকি অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ! কিন্তু আমি বলে রাখছি ভূতদের ক্ষ্যাপানোর ফল একদিন ওকে পেতেই হবে। ওরা

প্রতিহিংসা নিতে কখনো কসুর করে না !

কাজেই সবাই চুপ করে গেলাম। আমি আর জিম ভয়ে নিথর হয়ে বসে রইলাম। টম ব্যস্ত রইলো ওর কাজে। একসময় টম বেলুনটাকে থামিয়ে দিল। তারপর বলে উঠলো, ভোম্বলবাবুরা, এবার আপনাদের উঠতে আজ্ঞা হউক। দয়া করিয়া বেলুনের তলদেশে দৃষ্টিপাত করুন।'

আমরা টমের কথা মতন উঠে নীচে তাকাতেই দেখতে পেলাম পরিষ্কার নীল জলের একটা মস্ত সরোবর! মৃদু বাতাসে তার জল টলমল করছে ! এরকম মনোরম দৃশ্য এর আগে কখনো আমরা দেখিনি ! সরোবরের পাড়গুলো সবুজ ঘাসে ঢাকা ! সেখানে ফুল ফুটেছে নানা রঙের ! আঙুরলতা জড়ানো বড়ো বড়ো গাছেরা মিলে পাড়ের ওপর সৃষ্টি করেছে যেন নন্দনবন ! জায়গাটা এত শান্তিপূর্ণ, এত আরামদায়ক, যে দেখলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয় ! ভারী সুন্দর, আর মনোরম এই সরোবরটা !

জিম সত্যি সত্যিই আনন্দে লাফাতে লাফাতে চিৎকার করে উঠলো। জিম আর টম নীচে নেমে প্রাণভরে জল পান করলো। তারপর আমার জন্যেও নিয়ে এলো অনেকটা জল। আমি জীবনে অনেক ভাল ভাল জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই জলের কাছে তারা কিচ্ছু না।

এরপর টম নীচে নেমে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করলো। তারপর ও ওপরে উঠে এলে আমি আর জিম নীচে নেমে সাঁতার কাটলাম। তারপর জিম বেলুনে এসে টমকে ছেড়ে দিল। আমি আর টম সরোবরের পাড় ধরে দৌড়োতে লাগলাম, খেলতে লাগলাম, যা খুশি তাই করতে শুরু করলাম। এত ভাল সময় আমার জীবনে আগে কখনো এসেছিল কিনা আমি মনে করতে পারছি নে। সময়টা সন্ধ্যের কাছাকাছি ছিল বলে গরম বিশেষ ছিল না। আমাদের পরনে কোনো পোষাক-আসাক এসময় ছিল না। খুলে রেখেছিলাম সেগুলো। ইস্কুলে, শহরে, লোকালয়ে কাপড়-চোপড় পোষাক-আসাকের দরকার আছে। কিন্তু যেখানে সভ্যতার গোলমাল নেই, সেখানে লজ্জা নিবারণের কথা মনেই আসে না !

'সিংহ ! সিংহ আসছে ! সিংহ ! জলদি, মাস্টার টম ! হাক্, লাফ মেরে চলে এসো ! জিম উপর থেকে চিৎকার করে উঠলো।

আমরা পোশাকের জন্যে একবারও না থেমে কোনো রকমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। এসময় জিমের মাথার গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। যখুনি ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কিংবা ভয় পায়, তখুনি ওর এরকম হয়। এখনো তাই

হলো। পশুগুলো যাতে ছুঁতে না পারে সেজন্য সিঁড়িটাকে মাটি থেকে সামান্য ওঠানোর পরিবর্তে প্রবল বেগে ও বেলুনটাকে ওপরে উঠিয়ে দিল। আমরা সিঁড়ি ধরে দুলতে দুলতে সোঁ সোঁ বেগে ওপরে উঠতে লাগলাম। আমাদের ভাগ্য ভাল, জিম একসময় বুদ্ধি ফিরে পেয়ে বেলুনটাকে থামিয়ে দিল। কিন্তু এরপর কী করতে হবে, তা ভুলে গেছে ও! আমরা এত ওপরে উঠে এসেছিলাম যে সিংহগুলোকে মনে হচ্ছিল ছোট্ট কুকুরছানা!

টম সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেয়ে বেলুনটা নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে এলো। হিংস্র পশুগুলো ঠিক আমাদের নীচে বসেই ক্যাম্প-মিটিং করছিল। আমার মনে হলো, টমের মাথাটাও খারাপ হয়ে গেছে! কেন না, ও জানে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারি নে ভাল করে। অথচ ও কিনা আমাকে সিংহগুলোর মুখের কাছে নিয়ে এলো!

কিন্তু পরে বুঝলাম, তা না, ওর মাথাটা ঠিকই ছিল। ও বেলুনটাকে সরোবরের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে এসে তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচুতে দাঁড় করালো। তারপর বলে উঠলো, 'লাফিয়ে পড়।'

আমি লাফিয়ে পড়েই তলিয়ে গেলাম। যখন জলের ওপর ভেসে উঠলাম, টম বললো, 'চিৎ সাঁতার দিয়ে ভেসে থাকো। একটু বিশ্রাম নাও। সাহস ফিরে এলে আমাকে বলবে, আমি জলের ওপর সিঁড়িটা নামিয়ে দেব। তখন বেলুনের ওপর উঠে আসবে।'

ওর নির্দেশ মতন আমি কাজ করলাম। ও যদি আমাকে বালির ওপর নামিয়ে দিত, জানোয়ারগুলো ছুটে এসে আমাকে দিয়ে সান্ধ্যভোজ সারতো। কাজেই টম আমাকে জলে নামিয়ে দিয়ে ঠিক কাজই করেছিল।

এসময় সিংহরা আমাদের পোষাকগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার চেষ্টা চালাচ্ছিল, কিন্তু তা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সুরু হয়ে গেল ফলে সুরু হয়ে গেল এক ভয়ঙ্কর লড়াই! প্রায় পঞ্চাশটা জানোয়ার তর্জনগর্জন করতে করতে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দেখলেই পিলে চমকে ওঠে! লড়াই যখন শেষ হলো, তখন দেখা গেল, কিছু জানোয়ার মরে পড়ে আছে। কিছু জানোয়ার আহত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে যাচ্ছে! বাকি জানোয়াররা বসে আছে রণক্ষেত্রে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের ক্ষতস্থান চাটছে। অন্যরা আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে নীচে নেমে যাওয়ার জন্যে, যাতে আমাদের নিয়ে তারা লড়াইএর পরিশ্রমের পর একটু জলখাবার খেতে পারে।

পোশাকগুলো একটাও আস্ত অবস্থায় ছিল না। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল চারপাশে। পোষাকগুলোতে অনেক পেতলের বোতাম লাগানো ছিল। পকেটের মধ্যে ছিল ছুরি, তামাক, পেরেক, খড়ি, মার্বেল, বড়শি প্রভৃতি নানা রকমের টুকিটাকি জিনিস। কিন্তু সে-জন্যে আমাদের কিছু দুঃখ নেই। প্রফেসরের পোশাকগুলো বেলুনে অটুট অবস্থায় আছে। আমাদের গায়ে অবিশ্যি ঝুলে আর পাশে একটু বড়ো হবে, এই যা! একজন দর্জি পেলেই সমস্যা মিটে যাবে। আমাদের মধ্যে জিমকে বলা চলে একজন হাতুড়ে দর্জি! আমাদের প্রয়োজন মেটানোর মতন দু-এক সেট পোশাকও নিশ্চয়ই জলদি বানিয়ে দিতে পারবে!

মরুভূমির ওপর টমের বক্তৃতা

আমরা তবুও ভাবলাম, আমরা সেখানে মিনিট-খানেকের জন্যে নামবো, কিন্তু আরেকটা কাজে। প্রফেসর তাঁর বেশিরভাগ খাবার দাবার টিনের কৌটোর ভেতর এমনভাবে রেখেছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন কেউ এগুলো নতুন আবিষ্কার করেছে! অবশিষ্ট খাবারগুলোও ছিল বেশ টাটকা। মিসৌরির ব্রেকফাস্ট সাহারায় সারতে গেলে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে সারাই ভাল! তাই আমরা ঠিক করলাম, নীচে সিংহদের দরবারে নিয়ে গিয়ে আমরা কাজটা সেরে নেব।

সিংহগুলোর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে আমরা সিঁড়ি ধরে ঝুলতে লাগলাম। একটা দড়িতে ফাঁস তৈরি করে সেটার সাহায্যে একটা মরা সিংহকে তুলে আনলাম। সিংহটা ছোটো আর বেশ নরম। তারপর একটা মরা বাচ্চাকে তুলে নিলাম। এ সময় অবিশ্যি রিভলভারের সাহায্যে একবার পশুরাজদের দরবারটা ভেঙে দিতে হয়েছিল!

দুটো পশুরই চামড়া ছাড়িয়ে আমরা মাংস বের করে নিলাম। তারপর মালপত্র রাখার লকার থেকে প্রফেসরের ছিপ বের করে সেগুলোর বড়শিতে মাংসের টুকরো গেঁথে সরোবরে মাছ ধরতে গেলাম।

আমরা সরোবরের ওপরে এসে জল থেকে কিছুটা ওপরে বেলুনটাকে দাঁড় করিয়ে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে লাগলাম। সিংহের মাংসের টোপ যে মাছেদের কাছে কত প্রিয়, তা বুঝলাম একটার পর একটা মাছ বড়শিতে গেঁথে। এত চমৎকার মাছ এর আগে কখনো দেখিনি!

নৈশভোজটা দারুন জমলো। সিংহের টাটকা মাংস, আর মাছভাজা! আর

কী চাই !

কিছু মিষ্টি ফলও খেলাম আমরা। ফলগুলো সংগ্রহ করলাম মস্তবড়ো একটা গাছ থেকে। গাছটা রোগা, লম্বা। একটাও ডালপালা নেই। তার মাথার ওপর বিশাল বিশাল পাখির পালকের মতন পাতা। এটা একটা পাম জাতীয় গাছ। বইতে এজাতীয় গাছের ছবি দেখেছি। কোনো গাছে নারকেল ফলেছে কিনা খোঁজ নিলাম, কিন্তু পেলাম না। তার পরিবর্তে পেলাম এই আঙুরের মতন মতন গোছা গোছা ফল। টম জানালো, এগুলোর নাম খেজুর। কেন না, আরব্য রজনী এবং অন্যান্য বইতে খেজুরের যে-বর্ণনা দেওয়া আছে, তার সাথে এগুলো মিলে যাচ্ছে। অবিশ্যি এগুলো খেজুরও হতে পারে, আবার অন্য কোনো বিষাক্ত ফলও হতে পারে। তাই পাখিরা এগুলো খায় কিনা, তা দেখার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হলো। যখন দেখলাম, পাখিরা এগুলো খায়, আমরাও খেলাম। বড়ো সুস্বাদু মিষ্টি এই ফল !

ইতিমধ্যে বেশ কিছু বিশাল বিশাল পাখি (শকুন) এসে নিহত জানোয়ারদের মৃতদেহগুলোর সদ্‌গতি করতে শুরু করলো। কোনো জ্যান্ত সিংহরা যেই তাদের তাড়া করে, অমনি তারা হটে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ফিরে আসে ! সিংহরা তাদের কিছুই করতে পারলো না।

আকাশের চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিগুলো আসতে শুরু করলো। বহু দূর থেকে তারা আসছে, দূরবীন দিয়ে দেখা যাচ্ছে। অথচ খালি চোখে বোঝা যায় না, কত দূর থেকে আসছে তারা ! টম জানালো, পাখিগুলো কিন্তু খাবারের গন্ধ পেয়ে এখানে আসছে না, তারা আসছে খাবারগুলো চোখে দেখে। কত জোরালো এদের চোখের দৃষ্টি ! টম আরো জানালো, পাঁচমাইল দূরে দাঁড়িয়ে একটা সিংহের মৃতদেহকে একটা কালো বিন্দুর চেয়ে বড়ো দেখায় না। কল্পনা করা যায় না, অতদূর থেকে তারা এত ছোট্ট জিনিস দেখতে পায় কেমন করে !

সিংহ যে সিংহের মাংস খায়, এ-ব্যাপারটা যেমন আশ্চর্যজনক, তেমনি অস্বাভাবিক। আমরা ভেবেছিলাম, মৃত সিংহগুলো বোধ হয় জ্যান্ত সিংহগুলোর অনাত্মীয়। কিন্তু জিম বললো, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের পার্থক্য বোঝার জো নেই। ও বললো, একটা শুয়োর তার বাচ্চাদের ভালবাসে, মাকড়সাও ভালোবাসে তার বাচ্চাদের। ওর মতে সিংহরা হয়তো এই নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম। ও ভাবলো, একটা সিংহ যদি জানে তার বাবা কে, সে নিশ্চয়ই তার বাবার মাংস খাবে না। কিন্তু যদি ভীষণ খিদে পায়, সে নিশ্চয়ই তার শ্যালকের মাংস খাবে। আর শাশুড়ির মাংস তো সে সুযোগ পেলেই খায় ! কিন্তু ওর মনে করাই শুধু সার

হলো, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না। কাজেই প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিলাম আমরা।

সাধারণত মরুভূমির রাত্রি ভীষণ নিঝুম, নিস্তব্ধ। কিন্তু আজ যেন সঙ্গীতের আসর বসেছে! নানা জাতের জানোয়ার এসে মহাভোজে অংশ নিয়েছে। টম জানালো, একদল শিয়াল, আর একদল হায়নাও এসে হাজির হয়েছে। সবার চিৎকার-চেঁচামেচিতে মুখর হয়ে উঠেছে সরোবরের তীর। তারা সবাই মিলে এমন একটা ছবি তৈরি করেছে, চাঁদের আলোয় তারা এমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, যা কোনো বইতে ছাপা ছবির চেয়ে ঢের বেশি দর্শনীয়!

আমরা একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। তবুও ওদের কোলাহলে দু-তিনবার জেগে উঠে জানোয়ারদের অবস্থা দেখে নিলাম, তাদের সঙ্গীতও শুনলাম। সার্কাসে সামনের সারিতে বসে পশুদের খেলা দেখে যে-আনন্দ পাওয়া যায়, এ-আনন্দের কাছে তা তুচ্ছ বলে আমার মনে হলো। আজ ঘুমিয়ে থাকার চেয়ে জেগে থাকায় অনেক বেশি লাভ। এরকম দুর্লভ দৃশ্য দেখার সুযোগ আর কি কখনো পাব আমি!

খুব সকালে আবার আমরা মাছ ধরতে গেলাম। মরূদ্যানের মিষ্টি ছায়ায় আরাম করে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। হিংস্র পশুরা আসছে কিনা, সেদিকেও নজর রাখতে হলো। পরদিন আমরা এখান থেকে রওনা হব ভেবেছিলাম, কিন্তু জায়গাটার আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

পরের পরদিন যখন আমরা আকাশে উঠে পূবদিকে পাড়ি দিলাম, তখন আমরা জায়গাটার দিকে অনেকক্ষণ ফিরে তাকিয়ে রইলাম। আমরা এমন এক বন্ধুকে বিদায় জানালাম, যাকে আর বোধহয় কোনো দিন দেখতে পাব না আমরা! হ্যাঁ, জায়গাটাকে আমরা বন্ধুর মতনই ভালোবেসেছিলাম!

জিম আপন মনে কিছু একটা ভাবছিল। একসময় ও বলে উঠলো, 'মাস্টার টম, আমরা নিশ্চয়ই মরুভূমির শেষে এসে গেছি।'

'কী করে বুঝলি?' শুধোলো টম।

'আমরা তো অনেক সময় ধরে মরুভূমির ওপর দিয়ে চলেছি। মহাসাগর পার হতেও এত সময় লাগে না।'

'এখনো প্রচুর বালি রয়েছে। তোর দুর্ভাবনার দরকার নেই।'

'মাস্টার টম, আমি দুর্ভাবনা করতেছি নে, আমি শুধু অবাক হতেছি। ভগবান যে অনেক অনেক বালি সৃষ্টি করেছেন, আমার তাতে কিছু বলবার নেই। আমার শুধু সন্দেহ হতেছে এই মরুভূমি আমরা হয়তো কোনো দিনই আর পার হতি

পারবো না।'

'এখনো অনেক দূর যেতে হবে। এই মরুভূমি বিশাল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তো একটা বড়ো দেশ। তাই না, হাক্ ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তার চেয়ে বড়ো দেশ পৃথিবীতে আছে কিনা আমার জানা নেই।'

'এই মরুভূমিটার আকার আমাদের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বড়ো। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ছত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল। আর এই মরুভূমিটার আয়তন একচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার বর্গমাইল। এর আয়তনের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে রেখেও ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক আর গোটা জার্মানীকেও জায়গা দেওয়া যেতে পারে। তখনো তোমার হাতে থাকবে দুহাজার বর্গমাইল বালি। মাথায় ঢুকলো কিছু ?'

আমি বললাম, 'আমারই হার হলো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভগবান এই মরুভূমিটা সৃষ্টি করতে যতটা চেষ্টা করেছেন, ঠিক ততটাই চেষ্টা করেছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর অন্য দেশগুলো তৈরি করতে।'

জিম বললো, 'হাক, ও-যুক্তি ধোপে টেঁকে না। আমার মনে হয়, এই মরুভূমিটা আদৌ তৈরী করা হয় নি। এ থেকে মানুষের কী উপকার হচ্ছে বল দেখি ? হাক, তুমিই বল, কোনো উপকার হচ্ছে কি ?'

আমি বললাম, 'হচ্ছে না বলেই আমার ধারণা।'

'মাস্টার টম, তোমার কী মনে হতেছে ?' শুধোলো জিম।

'আমারও ওইরকমই মনে হয়।' বললো টম।

'যদি কোনো জিনিসের কোনো উপকার না থাকে, তার সৃষ্টি তো বৃথা। তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'ভগবান কি কোনো জিনিস বৃথা সৃষ্টি করতি পারেন ? উত্তর দাও।'

'না, তিনি তা করেন না।'

'তাহলে তিনি মরুভূমি সৃষ্টি করেছিলেন কেন ?'

'ঠিক আছে, তুইই বল, কেন তিনি এটাকে সৃষ্টি করেছিলেন ?'

'বাড়ি তৈরীর পর অনেক কাজে না লাগা রাবিশ পরে থাকে জান তো ? সেগুলোন কোথায় রাখা হয় ? সেগুলোন কি বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গায় রাখা হয় না ? এই মরুভূমিটাও হচ্ছে এই পৃথিবীর সেরকম একটা রাবিশ রাখার জায়গা। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, এটাকে ভগবান মোটেই সৃষ্টি করেন

নি। এটা আপনা থেকেই হয়েছে।'

আমি জিমের যুক্তি মেনে নিলাম। আমার বিশ্বাস, জিম এ-পর্যন্ত যত যুক্তি দেখিয়েছে, এটাই হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে সেরা। টমও তা স্বীকার করলো। তবে সেই সাথে ও জানালো, এককেটা যুক্তি আসলে হচ্ছে এককেটা তত্ত্ব। তবে তত্ত্ব কোনো কিছু প্রমাণ করে না। যখন আমি কোনো জিনিস কেবল খুঁজেই চলেছো, অথচ খুঁজে পাচ্ছ না, খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায়ও দেখতে পাচ্ছ না, তখন তত্ত্ব তোমাকে কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দেবে।

টম আরো বললো, 'তত্ত্বের একটা অসুবিধে এতে একটা না একটা ছিদ্র থাকবেই। চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে। জিমের এই তত্ত্বটার মধ্যেও ছিদ্র আছে। তাকিয়ে দেখ, আকাশে কোটি কোটি তারা মিটমিট করছে। এটাই কি একমাত্র সত্যি, ওই তারাগুলোই আকাশের সব তারা? ওদের বাইরে কেউ নেই? ছায়াপথ দেখেছো তো? সেখানেও আছে অসংখ্য তারা। সেই তারাদের কোনোটায় কি বালির স্তূপ নেই?'

জিম শুধোলো, 'মাস্টার টম, ছায়াপথ কী?

জিমের প্রশ্নে শ্রীমান টম একেবারে 'থ'!

আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না, তত্ত্বজ্ঞানী টমের জানা নেই ছায়াপথের তত্ত্ব! এককেটা লোক আছে, যুক্তিতে হেরে গেলেও হারাটাকে কিছুতেই মেনে নেয় না। টমের চরিত্র হচ্ছে সেরকম।

টম সয়্যার জব্দ হয়েছে! ওর মুখে আর রা নেই! পিঠে হঠাৎ আঘাত পেয়ে যে-লোক মূর্ছিত হয়, তার চাউনির সাথে এখন বেশ মিলে যাচ্ছে শ্রীমান টম সয়্যায়ের চাউনি! জিমের প্রশ্নের উত্তরে ও যা বললো, তা বিদ্যে-অবিদ্যের একরকম অখাদ্য খিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই না!

আমরা মরুভূমির আয়তন-প্রসঙ্গে আবার ফিরে এসেছিলাম। যতই আমরা একে এটার সাথে, ওটার সাথে, সেটার সাথে তুলনা করতে লাগলাম, এটাকে ততই আরো বেশি বেশি করে মহত্তর, বৃহত্তর বলে মনে হতে লাগলো! অবশেষে টম আবিষ্কার করে ফেললো, আয়তনে এটা প্রায় চীন সাম্রাজ্যের[১] সমতুল্য। তারপর ও আমাদের দেখিয়ে দিল, ম্যাপে চীন সাম্রাজ্য কী ভাবে বিস্তার লাভ করছে, আর পৃথিবীতে সে কী করে তার জায়গাটা তৈরি করে নিয়েছে!

আমি অবাক হয়ে বলামাম, এই মরুভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু এর যে এত গুরুত্ব আছে, তা আগে কখনো শুনি নি।'

---

(১) একশো বছর আগের চীন সাম্রাজ্য।

টম অমনি বলে উঠলো, 'গুরুত্ব! মানে গুরুত্বপূর্ণ! তার মানে, বলতে চাইছো সাহারা মরুভূমি গুরুত্বপূর্ণ! হ্যাঁ, কিছু লোকের কাছে তো নিশ্চয়ই। যদি কোনো জিনিস আয়তনে বড়ো হয়, অমনি কিছু লোকের কাছে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়! কোনো জিনিসের গুরুত্বের বিচার তারা করে শুধু তার আকার দেখে!' টম আবার বললো, 'অথচ ইংলণ্ডের[২] দিকে তাকাও। এটা এখনকার পৃথিবীর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। অথচ একে চীনের ফতুয়ার পকেটে অনায়াসে পোরা যায়। এবার তাকাও রাশিয়ার[৩] দিকে। এই দেশটা বিশাল, সবদিকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। তবু এর গুরুত্ব তেমন কিছু বেশি নয়।

দূরে একটা পাহাড়—ছোট্ট পাহাড় দেখতে পেলাম। ওটা যেন দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। টম দূরবীণের সাহায্যে পাহাড়টাকে একবার দেখেই উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে বলতে লাগলো, 'ওই পাহাড়টাই—হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে সেটা। আমি যেটাকে দেখতে পাচ্ছি, ওটাই হচ্ছে সেই পাহাড়টা। আমার কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ওই পাহাড়টার মধ্যেই দরবেশ সেই লোকটাকে নিয়ে গিয়েছিল, আর সমস্ত ধন-দৌলত তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।'

অতএব আমরা স্থির দৃষ্টিতে পাহাড়টাকে দেখতে লাগলাম, আর টম ওই পাহাড়টা সম্বন্ধে বলতে লাগলো এমন একটা গল্প, যেটা নাকি 'আরব্য রজনী'তে লেখা আছে!

দৌলত পাহাড়

টম বললো, ঘটনাটা এরকম ঘটেছিল: কোনো এক প্রচণ্ড গরমের দিনে মরুভূমির ওপর দিয়ে পদব্রজে এগিয়ে চলেছেন এক দরবেশ। হাজার মাইল দূর থেকে আসছেন তিনি। তিনি ছিলেন ভীষণ গরিব। তার ওপর ছিলেন ভীষণ ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত। পথ চলতে চলতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি আর চলতে পারেননা। 'চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল', এমনই তাঁর অবস্থা!

এখন আমরা যেখানে রয়েছি, প্রায় এই জায়গাটায় এসে দরবেশ একজন উটচালকের সাক্ষাৎ পেলেন। উটচালকের সাথে আছে একশোটা উট। তার কাছে দরবেশ কিছু ভিক্ষে চাইলেন। কিন্তু সে দরবেশকে ভিক্ষে দেওয়ার পরিবর্তে উল্টে তাঁর কাছে চেয়ে বসলো আরেকটা জিনিস, যার নাম মাফ!

দরবেশ তখন তাকে শুধোলেন, 'এই উটগুলো কি তোমার নয়?'

---

(২) একশো বছর আগের ইংলণ্ড। (৩) বিপ্লব-পূর্ব রুশ-সাম্রাজ্য

'হ্যাঁ, আমার।' বললো উটচালক।

'তোমার কোনো ধারদেনা আছে?'

'আমার! না, আমার কোনো ধারদেনা নেই।'

'তাহলে বলতে হয় যে-লোক একশোটা উটের মালিক, আর যার কোনো ধারদেনা নেই, সে হচ্ছে ধনী। সাধারণ ধনী নয়, মস্ত বড়ো ধনী। তাই না?'

উটচালক কথাটা স্বীকার করলো।

তখন দরবেশ বললেন, 'আল্লা তোমাকে করেছেন মস্ত বড়ো ধনী, আর আমাকে করেছেন নিতান্ত গরিব, তার সেবক। আমাদের এ-ভাবে সৃষ্টি করার পেছনে নিশ্চয়ই তাঁর যুক্তি আছে। অবশ্যই সুযুক্তি। তিনি চান, তাঁর সৃষ্ট ধনী লোকেরা তাঁর সৃষ্ট গরিব লোকেদের সাহায্য করুক। তুমি-আমি একই সৃষ্টিকর্তার সন্তান। সেই অর্থে আমি তোমার ভাই। অথচ আমার প্রয়োজনের সময় তুমি আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে! আল্লা এটা মনে রাখবেন। জেনে রাখ, এর ফলে তোমার ক্ষতি হবে।'

দরবেশের কথায় উট-চালক দুর্বলতা অনুভব করলো। কিন্তু সে হচ্ছে জন্মসূত্রে অর্থপিশাচ, একপয়সা ক্ষতি স্বীকার করতেও রাজি নয় সে। তাই সে দরবেশের কথা শুনে কাঁদুনি গাইতে শুরু করলো। সে বলতে লাগলো, তার সময়টা খুবই খারাপ যাচ্ছে। যদিও সে বালসোরা পর্যন্ত মোটা টাকায় উটগুলোকে ভাড়ায় খাটিয়েছিল, কিন্তু ফিরতি পথে খালি অবস্থায় ফিরতে হচ্ছে তাকে। কাজেই আপাতত দানধ্যানের মতন মহৎ কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

দরবেশ আবার বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, তুমি যদি আল্লার নির্দেশ অমান্য করার ঝুঁকি নাও, আমার কিছু বলার নেই। তবে আমি মনে করি, আমাকে সাহায্য না করে তুমি ভুল করছো, আর লাভের একটা সুযোগও হারাচ্ছো।'

উট-চালক ভাবলো, দরবেশ লাভের যে সুযোগটার কথা বলতে চাইছেন, তার মধ্যে পয়সাকড়ির ব্যাপার থাকতে পারে। তাই সে দরবেশের কাছে ছুটে এসে সুযোগটা কী তা জানানোর জন্যে তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলো।

দরবেশ তখন তাকে বললেন, 'দূরের ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ তো? ওই পাহাড়টার মধ্যে আছে পৃথিবীর যাবতীয় ধনদৌলৎ। আমি এমন একজন ভাল দয়ালু মহান্ মানুষকে খুঁজছি, যাঁর চোখে দৈবপ্রাপ্ত একটু মলম ঘসে দিলেই তিনি সেই ধনদৌলৎ দেখতে পাবেন আর সেখান থেকে তা বের করে আনতে পারবেন।'

উট-চালক সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টে ফেললো। দরবেশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে

কাতর-কণ্ঠে বলে উঠলো, দরবেশ যেরকম লোক চাইছেন, ও হচ্ছে ঠিক সে-রকমেরই একজন লোক। হাজারটা সাক্ষী ও যোগাড় করে আনতে পারে, যারা বলবে, ওর চরিত্রটা আগে যে-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, ও সে-চরিত্রের লোকই নয়।

দরবেশ তখন বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই বিশ্বাস করছি। যদি একশোটা উট ধনরত্ন বোঝাই করা হয়, অর্ধেক আমি পাব কি?'

উট-চালকের কাছে এ এক অবিশ্বাস্য প্রস্তাব! সানন্দে রাজি হয়ে গেল ও।

দরবেশ তখন তাঁর বাক্স থেকে মলম বের করে লোকটার ডানচোখে ঘষে দিলেন। দৌলত পাহাড়টা অমনি তার চোখের সামনে দেখা দিল, পরে সে দরবেশের সাথে তোষাখানার ভেতরেও প্রবেশ করলো। সেখানে সে রাশিরাশি সোনাদানা মণিমুক্তো হীরে-জহরৎ দেখতে পেলো। সেসব দেখে তার মনে হলো, যেন আকাশের তারারা ওখানে পড়ে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে!

দরবেশ আর উট-চালক মিলে একশোটা উটের প্রত্যেকটার পিঠের ওপর সেই সোনাদানা মণিমুক্তো হীরে-জহরৎ ভর্ত্তি বস্তাগুলো বোঝাই করলেন। যতটা বেশি সম্ভব, ততটা করে বোঝাই করলেন। তারপর তুজন তুজনকে বিদায় জানিয়ে আধাআধি সংখ্যক উট নিয়ে যাত্রা করলেন তাঁদের নিজের নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে।

একটু বাদে উট-চালক ছুটে এসে দরবেশকে ধরে ফেললো। তারপর বললো, 'আপনি তো আর সংসারী লোক নন। আপনি যা ভাগে পেয়েছেন, তার সবটা নিশ্চয়ই আপনার দরকার নেই। আপনি কি আপনার ভাগ থেকে দশটা উট আমাকে দিয়ে দিতে পারেন না?'

দরবেশ বললেন, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার ভাগ থেকে দশটা উট নিতে পার।' এই বলে তিনি দশটা উট লোকটাকে দিয়ে দিলেন।

আবার তুজনের তুদিকে চলা সুরু হলো। দরবেশ এগিয়ে চলেছেন তাঁর চল্লিশটা উট নিয়ে। কিন্তু একটু বাদেই উটচালক আবার তাঁর কাছে ছুটে এসে আরো দশটা উট ভিক্ষে চাইলো। তার যুক্তি, তিরিশটা ধনদৌলত বোঝাই উট একজন দরবেশের পক্ষে যথেষ্ট। কেন না, তাঁরা খুব সাদাসিধে ভাবে জীবন-যাপন করেন। তাঁরা ঘর বেঁধে বাস করেন না, কেবল ঘুরে ঘুরে মানুষকে উপদেশ দিয়ে বেড়ান।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। উটচালকের আকাঙ্ক্ষা বেড়েই চললো। দশটা দশটা

করে পঞ্চাশটা উটই সে দরবেশের কাছ থেকে চেয়ে নিল। একশোটা উটই নিজের ভাগে পেয়ে তবে সে সন্তুষ্ট হলো। তারপর কৃতজ্ঞতার সাথে বললো, সে দরবেশের কথা কখনো ভুলবে না। কেননা, এত উদার ও সদয় ব্যবহার তার সাথে এর আগে কেউ করেনি। এই বলে সে দরবেশকে সেলাম জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল। খুশিতে ডগমগ করছে উটচালকের মন। করবেই তো! কেন না, তার মতন ধনী লোক এ-দুনিয়ায় আর তো কেউই নেই এখন!

কিন্তু দশটা মিনিটও কাটলো না। উটচালকের মন এরই মধ্যে অসন্তুষ্টিতে ভরে গেল! কারণ তার মতন নরাধম অর্থপিশাচ জগতে আর একটাও ছিল না। কাজেই সে আবার ছুটে এলো দরবেশের কাছে। এবার সে দরবেশের কাছে প্রার্থনা জানালো তার অন্য চোখটায় একটু মলম লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে।

দরবেশ শুধোলেন, 'কেন?'

'আপনি তা ভালই জানেন।' বললো উটচালক।

'আমি ভালই জানি? তার মানে?'

'আপনি আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না। আমার কাছে আপনি যে কিছু লুকোনোর চেষ্টা করছেন সেটা আপনি ভালই জানেন। আমার ধারনা, আপনি যদি আমার অন্য চোখটায় একটু মলম লাগিয়ে দেন, তাহলে আমি আরো অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পাব। আসুন, দয়া করে আপনি আমার বাঁ চোখটায় একটু মলম লাগিয়ে দিন।'

দরবেশ বললেন, 'আমি তোমার কাছে কিছুই লুকোই নি। তোমাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই, মলমটা যদি তোমার অন্যচোখে লাগাই, তুমি আর কখনো কিছু দেখতে পাবে না। তুমি সারা জীবন অন্ধ হয়ে থাকবে।'

কিন্তু দরবেশের কথা উটচালক বিশ্বাস করলো না। সে পীড়াপীড়ি সুরু করলো, মলম লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে। দরবেশের কোন কথাই কানে তুললো না সে। দরবেশ তখন মলমের বাক্সটা খুলে উটচালককে বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে নিজের হাতে মলমটা নিয়ে চোখে লাগাতে পার।' উটচালক তাই করলো, আর মিনিটখানেকের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেল! বাদুড়ের মতন অন্ধ! দরবেশ তখন উটচালককে উপহাস-বিদ্রূপ-কৌতুক করে বলে উঠলেন, 'বিদায় বন্ধু! তুমি এখন অন্ধ। অন্ধ লোকের তো সোনাদানার কোনো প্রয়োজনই নেই! তাই না?' একথা বলে তিনি উটচালককে সেখানে সেই দিগন্তবিস্তৃত বিশাল মরুভূমির মাঝখানে ফেলে রেখে একশোটা উট নিয়ে চলে গেলেন!

অন্ধ উটচালক নির্বান্ধব অবস্থায় নিতান্ত দারিদ্র্য আর অপরিসীম দুর্দশার মধ্য

দিয়ে জীবনের বাকি দিনকটা মরুভূমিতে কাটাতে বাধ্য হলো!

জিম জানালো, 'সে বাজি রেখে বলতে পারে, এটা ছিল উটচালকের কাছে একটা শিক্ষা।

টম বললো, 'একটা মানুষ জীবনে অনেক শিক্ষাই পায়। কত যে পায়, তার হিসেব নেই। কেন না, মানুষের জীবনে ঘটনা কখনো একই ভাবে ঘটে না। হেন স্কার্ভল যখন চিমনী থেকে পড়ে গিয়ে পিঠ ভেঙ্গে ফেলেছিল এবং পিঠটা ভেঙে যাওয়ার দরুণ সে সারাজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, তখন প্রত্যেকেই বলেছিল, ওর একটা শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু কী ভাবে এটা ও কাজে লাগাবে? ও তো আর কখনো চিমনীতে উঠতে পারবে না। তাছাড়া আরেকবার ভাঙার মতন পিঠও ওর আর ছিল না!'

জিম বললো, 'মাস্টার টম, মানুষ এভাবেই অভিজ্ঞতার মধ্যি দিয়ে শিক্ষা লাভ করে। যে-বাচ্চা আগুনে একবার পুড়ি গেছে, সে আগুনকে বেজায় ভয় পায়।'

'আমি অস্বীকার করছি নে, একই ঘটনা একই ভাবে দুবার যদি কোনো মানুষের জীবনে ঘটে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা তার জীবনে একটা শিক্ষা। এমন অনেক ঘটনা আছে, যা সত্যিই মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। আঙ্কল আবনার সব সময় সেকথা বলে থাকেন। কিন্তু এমন লক্ষ লক্ষ ঘটনা আছে, যা একজনের জীবনে একই ভাবে দুবার ঘটে না। কাজেই তার কাছে সেসব শিক্ষার কোনো দামই নেই। গুঁটিবসন্তের চেয়ে সেগুলো মোটেই বেশি শিক্ষণীয় নয়। ধর, তুই গুঁটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিস, তখন টীকে নিয়ে তোর কোনো লাভ হবে কি? আর রোগটা সেরে যাবার পর টীকে নেওয়ার কোনো দরকারই থাকবে না। কেন না, গুঁটিবসন্ত জীবনে দুবার হয় না। আঙ্কল আবনার বলেন, কোনো লোক যদি একবার কোনো ষাঁড়ের লেজ ধরে টানে, তাহলে যে-লোক কখনো ষাঁড়ের লেজ ধরেনি, তার চেয়ে সে ষাট-সত্তর গুণ বেশি শিক্ষা লাভ করে। তিনি আরো বলেন, কোনো লোক যদি একটা বিড়ালের লেজ ধরে এবং সেটাকে একবার বাড়িতে নিয়ে যায়, তাহলে তারপর যে-শিক্ষা সে লাভ করবে, সেটা তার কাজে লাগবে, আর কখনো সেই শিক্ষা সে ভুলবে না। কিন্তু জিম, আমি তোকে বলছি, যারা সব সময় সব ঘটনার মধ্যেই কেবল শিক্ষা খোঁজে, তাদের কাছে আঙ্কল আবনারের হার হবে। তাই বলছিলাম—।'

জিম ঘুমিয়ে পড়েছিল। টম ওর দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে গেল। যখন কেউ অসাধারণ ভাল কোনো বক্তব্য রাখে, অথচ দেখে তার শ্রোতা তাকে প্রশংসা করার পরিবর্তে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তার খুবই খারাপ লাগে! তবে টম নিজে

এখন ঘুমোতে যাচ্ছে না, কেন না সেটা আরো খারাপ ব্যাপার হবে! কোনো লোকের ভাল ভাল কথা যদি তার শ্রোতা ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে বলে দেখতে পাও, তাহলে কাকে দোষ দেবে তুমি? দুজনকেই দেবে নাকি?

জিমের নাক ডাকতে স্থরু করলো প্রথমে আস্তে আস্তে, কান সওয়া মতন। তারপর ক্রমশ বাড়তে লাগলো সেই ডাক। বাড়তে বাড়তে তা এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ালো, যা অন্য একজন ঘুমন্ত লোককে অনায়াসে জাগিয়ে দিতে পারে! কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর নিজের ঘুমের সেই নাক ডাকার শব্দ একটুও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না! অথচ শব্দটা হচ্ছে ওর নিজেরই কান থেকে মাত্তর তিনইঞ্চি দূরে! মানুষের নাক ডাকার ব্যাপারটা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস বলে মনে হয়। কিন্তু তুমি একটা মোমবাতি জ্বালানোর জন্যে একটা দেশলাই কাঠি ঠোকো, দেখবে সেই অল্প একটু শব্দেই নাকডাকনেওয়ালার ঘুম ভেঙ্গে যাবে! এই মুহূর্তে জিমের নাক ডাকার শব্দে সারা মরুভূমিটাই যেন সতর্ক হয়ে উঠেছে! শব্দের আকর্ষণে জানোয়াররা আমাদের পেছনে পেছনে চলেছে মাইলের পর মাইল, বেলুনের ওপরে কী ঘটছে তা দেখার জন্যে! অথচ জিমদাদাজীর, যার শরীর হচ্ছে এই দুঃশব্দের উৎস, তার কিন্তু ঘুমই ভাঙছে না! অতএব প্রথমে ডাকাডাকি, পরে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করে ওকে জাগাতে হলো।

জিম জানালো, ও তেমন ঘুমোয়নি, শুধু টমের কথা ভাল করে শোনার জন্যে চোখদুটো ইচ্ছে করেই বুঁজে ছিল।

টম বললো, 'কেউই তোকে চোখ বোঁজার জন্যে দোষ দিচ্ছে না।'

জিম আমাদের দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন ও ঘুম থেকে উঠে কিছুই আমাদের বলেনি। সমানে বকবক করতে শুরু করলো ও, ক্রমাগত এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে। উট চালককে গালাগালি দিতে শুরু করলো! উট চালকের নিন্দায় ও এমন নির্দয় হয়ে উঠলো যে, আমি ওকে সমর্থন না করে পারলাম না! আবার দরবেশের প্রশংসায় যখন ও পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো, তখনো ওকে সমর্থন না জানিয়ে পারলাম না।

কিন্তু টম বললো, 'আমি তোমাদের মতে মত দিতে পারছি না। তোমরা সেই দরবেশকে উদার, উত্তম, নিঃস্বার্থ ভাবতে পার, আমি কিন্তু পুরোপুরি তোমাদের সাথে একমত নই। তিনি তো অন্য কোনো দরিদ্র দরবেশের সাথে দেখা করতে পারতেন। পারতেন না? কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি যদি এতই নিঃস্বার্থ ব্যক্তি, তাহলে তিনি একা সেখানে গিয়ে নিজের ঝোলা ভর্তি

সোনাদানা নিয়ে চলে গেলেন না কেন ? কেন তিনি অল্পতে সন্তুষ্ট ছিলেন না ? কাজেই বোঝা যায়, তিনি নিঃস্বার্থ ছিলেন না। তিনি এমন একটা লোককে খুঁজছিলেন, যে হবে একশোটা উটের মালিক ! তিনি চাইছিলেন, যত ধন-দৌলত সেই দৌলত-পাহাড়ে ছিল, সবকিছু নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়তে।'

জিম বললো, 'কেন, মাস্টার টম, তিনি তো চেয়েছিলেন কেবল আধাআধি বখরা নিতে। মাত্তর পঞ্চাশটা উট চেয়েছিলেন তিনি।'

'কারণ তিনি জানতেন, 'পরিণামে কী ভাবে তিনি সব কটা উটই পেতে চলেছেন !'

'মাস্টার টম, তিনি তো উটচালককে বলেছিলেন, আরেকটা চোখে মলম লাগালে সে অন্ধ হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন। কেন না, তিনি লোকটার চরিত্রটা জানতেন। ঠিক এরকম একটা লোককেই তিনি খুঁজছিলেন, যে কারোর সততায় কিংবা মহত্বে বিশ্বাস করে না, কেন না তার নিজের মধ্যে ও-তুটোর অস্তিত্ব ছিল না ! আমার ধারণা, ওই দরবেশের মতন বহু মানুষ এ-সংসারে আছে। তারা সব সময় মানুষকে ঠকায়, কিন্তু মানুষের কাছে এমন ভাব দেখায়, যেন তারা বলা সত্বেও মানুষরা নিজেদের বোকামির জন্য সব সময় ঠকে যাচ্ছে ! তারা সব সময় আইনের খোলসের মধ্যে থাকে, সুতরাং তাদের ধরাছোঁয়ার উপায় থাকে না। তারা কাউকে অন্ধ করে দেওয়ার জন্যে নিজেরা কখনো মলম মাখিয়ে দেয় না, কেন না তাতে পাপ হয়। কিন্তু তারা জানে, কী ভাবে তোমাদের বোকা বানাতে হয়, যাতে তোমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে মলম মাখিয়ে অন্ধ হয়ে যাও ! আমার মতে দরবেশ আর উটচালকটা ছিল চালাক আর বোকার একটা অদ্ভুত জুড়ি ! তুজনেই তুষ্টু লোক ! তুজনেই সমান অসৎ !'

'মাস্টার টম, তুমি কি মনে কর, সে-রকম কোনো মলম আজও পৃথিবীতে আছে ?'

'আছে। আঙ্কল আবনার তাই বলেন। তিনি বলেন, নিউ—ইয়র্কের কিছু লোকের হাতে এই মলম এসেছে। তারা দেশের লোকের চোখে তা লাগিয়ে দিয়ে জগতে যত জিনিস পত্র আর রেলগাড়ি আছে, সব তাদের দেখিয়ে দেয়। দেশের লোকেদের তারা আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে, তাক লাগিয়ে দিয়ে বোকা বানায়। তারপর একদিন দেশের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের অন্য চোখে সেই মলম ঘষে অন্ধ হয়ে পড়ে। তখন মলমওয়ালারা তাদের বিদায় জানিয়ে জিনিসপত্র আর রেলগাড়ি নিয়ে তাদের কাছ থেকে সরে পড়ে !' তারপর একটু থেমে, দূরে

একনজর তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো টম, 'ওই যে সেই দৌলত পাহাড়! নীচে, ওই ওখানে!'

আমরা নীচে নেমে পড়লাম। কিন্তু জায়গাটাকে যতটা চিত্তাকর্ষক ভেবেছিলাম এখন দেখছি ততটা না। কেন না, পাহাড়ের যে-খানটায় তারা ধনদৌলত খুঁজে পেয়েছিল, সেই জায়গাটা আমরা খুঁজে পেলাম না। তবুও যে-পাহাড়ে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল, নিছক সেটা দেখার মধ্যেও কম আনন্দ ছিল না। জিম বললো, তিনডলারের বিনিময়েও ও পাহাড়টা দেখার সুযোগ হাতছাড়া করবে না। আমারও একই মত।

আমার আর জিমের কাছে সব থেকে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে এই সাহারায় আগমন। টম কী ভাবে আমাদের নিয়ে এলো এখানে! সোজা এগিয়ে যেতে যেতে এত পাহাড়ের ভেতর থেকে একটাকে দেখেই ও কেমন চিনে ফেললো দৌলত পাহাড় বলে! এ-জন্যে নিজের বিদ্যে আর প্রকৃতিদত্ত শক্তি ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্য ও পায়নি। আমরা এ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কী ভাবে ও এটা করলো!

টমের মতো এতো ভাল মাথাওয়ালা ছেলে আমি কোথাও দেখি নি। আমার মতে ওর বয়েস নিতান্ত কম বলেই ও ক্যাপটেন কিড্ কিংবা জর্জ ওয়াশিংটনের মতো নাম করতে পারছে না!

কাছেই টম একটা লবণহ্রদ দেখতে পেল। আমরা ভেলার সাহায্যে সেখান থেকে লবণ তুলে সিংহের চামড়াদুটো ভর্তি করলাম। এর ফলে আর কিছু না হোক, চামড়াদুটো পরিষ্কার করার সময় জিমের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে পড়বে!

মরুঝড়

আমরা এগিয়ে চলেছি আকাশপথে। দিন দুয়েক কোনো ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল। সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ যেই মরুভূমির অন্য প্রান্তের মাটি স্পর্শ করলো, অমনি আমাদের চোখে পড়লো একদল বেঁটেখাটো কালোকোলো মানুষের লম্বা সারি। মহামরুর বালির ওপর দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে সার বেঁধে। মানুষ-গুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, কে যেন তাদের কালি দিয়ে নিপুণ হাতে এঁকে রেখেছে! এটা চাঁদের আলোয় চকচকে বালির উপর আরেকটা মরুযাত্রিদল। আমরা গতি কমিয়ে তাদের পিছু পিছু চললাম। এটা করলাম শুধু একদল সঙ্গী পাওয়ার জন্যে। অবিশ্যি আমরা যেদিকে যেতে চাই, ওরা সেদিকে যাচ্ছিল না।

পরদিন সকালে যখন স্যিমামা পুবআকাশে উঠে দাঁড়ালো, তখন সোনালি বালির ওপর উটগুলোর দীর্ঘ ছায়া ছড়িয়ে পড়লো। তা দেখে আমাদের মনে হচ্ছিল যেন আমাদের পিতামহের দল লম্বা লম্বা পা ফেলে মিছিল করে এগিয়ে চলেছেন! আমরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে মরুযাত্রীদের অনুসরণ করে চললাম, যাতে আমাদের দেখতে পেয়ে তারা বিশৃঙ্খল হয়ে না পড়ে, তাদের মিছিলটা যাতে ভেঙে না যায়! দামী পোষাক আর রাজকীয় চালচলনের এরকম চিত্তাকর্ষক চলিষ্ণু ছবি আমরা এর আগে কখনো দেখিনি। কয়েকজন দলপতি এককুঁজবিশিষ্ট আরবী উটে চড়ে এগিয়ে চলেছেন। এত বড়ো উটও আগে কখনো দেখি নি। খুব উঁচু আর লম্বা এই উটগুলো। দীর্ঘ পদক্ষেপে এত দ্রুতবেগে তারা এগিয়ে চলেছে যে, মনে হচ্ছে যেন রণপায়ে ভর দিয়ে মরুপথ পাড়ি দিচ্ছে তারা! আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সাধারণ উটের চেয়ে এই এককুঁজবিশিষ্টদের গতি অনেক—অনেক বেশি।

দুপুরবেলা মরুযাত্রীরা তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিল। বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে আবার তারা যাত্রা শুরু করলো। অনেক আগে থেকেই সূর্য খুব চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। প্রথমে হলো পেতলের মতন। তারপর হলো তামার মতন। তারপর তাকে দেখতে লাগলো একটা রক্ত-লাল গোলকের মতন। বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-আকাশে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার! ওদিকের আকাশটা যেন ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল! তার ওপর ছড়িয়ে পড়লো আগুনের মতন ভয়াল লাল আভা! আমরা নীচে তাকিয়ে দেখলাম, মরুযাত্রীরা ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তারা ঝটপট বালির ওপর শুয়ে পড়লো, স্থির হয়ে!

একটু বাদেই দেখতে পেলাম, কিছু একটা প্রবল বেগে ছুটে আসছে। যেন একটা বিশাল দৈত্য! তারপর সেই দৈত্যটা বিশাল চওড়া একটা পাঁচিলের মতন আকার নিয়ে খাড়া হয়ে গেল মরুভূমির ওপর। তারপর সেটা উঁচু হতে হতে আকাশ ঢেকে ফেললো! ঢেকে ফেললো সূর্যকে! যেন হাজার-লক্ষ ক্রুদ্ধ রাক্ষসের মতন তার মূর্তি!

এরপর একটা হাল্কাবাতাস স্পর্শ করলো আমাদের। তারপর তা ক্রমশ জোরালো হতে লাগলো। আগুনের মতন গরম বালি এসে পুড়িয়ে দিতে লাগলো আমাদের মুখ। টম চেঁচিয়ে উঠলো, 'মরুঝড় উঠেছে। যে-দিক থেকে ঝড় আসছে, সেদিকে পেছন ফিরে থাক।'

টমের কথা মতন আমরা সঙ্গে সঙ্গে বালির দিকে পেছন ফিরে পাটাতনের উপর বসলাম। পরের মিনিটেই ঝড় এলো প্রচণ্ড বেগে! ধামাধামা বালি এসে পড়তে

লাগলো আমাদের শরীরে। আকাশ বালিতে চারপাশ এমন ভর্তি হয়ে গেল যে, আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। পাঁচমিনিটের মধ্যেই বেলুন-নৌকোটা বালিতে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল! আমরা বসে আছি পাটাতনের ওপর ঠেস দিয়ে। বালিতে আমাদের চিবুক পর্যন্ত ডুবে গেল! আমাদের মাথাগুলো শুধু বেরিয়ে রইলো। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো।

একটু বাদে ঝড়ের প্রকোপ কমে এলো। আমরা দেখতে পেলাম ভয়াল-বিশাল পাচিলটা মরুভূমির ওপর দিয়ে সরে যাচ্ছে দূরে। দেখলেই বুক ধড়ফড় করে! আমরা বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নীচে তাকালাম। আগে যেখানে মরুযাত্রীরা ছিল, সেখানে বালির মহাসমুদ্র পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। সব কিছুই শান্ত, নিস্তব্ধ! মানুষ আর উটের দলটা বালিতে চাপা পড়ে মরে গেছে! আমাদের মনে হলো, তারা দশফুট বালির নীচে চাপা পড়ে গেছে! টম মন্তব্য করলো, হয়তো কয়েক বছর বাদে বাতাস তাদের শরীরের ওপর থেকে বালি সরিয়ে দেবে। তার আগে পর্যন্ত তাদের আত্মীয়-স্বজনরা জানতেও পারবে না, তাদের এই মর্মন্তুদ মৃত্যুর কথা!

টম বললো, 'এখন বুঝতে পারছি, আমরা যাদের তরবারি আর পিস্তল কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল!'

হ্যাঁ মশাই, ঠিক এরকমই ঘটেছিল তাদের ভাগ্যে, মরুঝড়ে তারা একদিন সমাধিস্থ হয়েছিল। ফলে বন্য পশুরা তাদের মৃতদেহগুলো খেতে পারে নি! আর যতদিন না তাদের চামড়াগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল, আর তাদের শরীরের মাংস খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছিল, ততদিন বাতাস তাঁদের মুক্ত করেনি। একটা মানুষের পক্ষে তার প্রিয়জনের মৃত্যুতে যতটা শোক পাওয়া সম্ভব, আমরাও সেই হতভাগ্য মরুযাত্রীদের জন্যে ঠিক ততটাই শোক পেয়েছিলাম। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে গিয়ে পৌছেছিলাম, তখন তাদের মৃত্যুর কারণ আমরা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন আমাদের চোখের সামনে মরুঝড়ে যে-মরুযাত্রীদের মৃত্যু আমাদের কাছে ভীষণ অসহনীয় হয়ে উঠলো। কষ্টে আমাদের বুকগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইছে! তোমরা দেখ, মরুযাত্রীরা বিদেশী, তারা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা। আগের একটা দলের বাচ্চা হারানো একজন মহিলার সাথে আমাদের সামান্য একটু পরিচয় হয়েছিল। শেষের দলটার বেলায় সেরকম কিছুও ঘটেনি। কেবল একটা পুরো রাত আর প্রায় একটা পুরো দিন তাদের কাছাকাছি ছিলাম বলে সত্যিকারের বন্ধুর মতন তাদের মনে হয়েছিল! আমি দেখেছি, কোনো লোককে তুমি ভালোবাস না ঘৃণা কর, তা

বের করতে গেলে তার সাথে বেড়াতে যাওয়ার মতন নির্ভুল পথ আর নেই। এখন এই মরুযাত্রীদের কথাই ধর। যতই আমরা তাদের অনুসরণ করেছি, ততই বেশি বেশি করে তারা আমাদের মনে জায়গা করে নিয়েছে, আমরা তাদের অনুসরণ করে আরো বেশি বেশি আনন্দ পেয়েছি। তাদের কেউ কেউ আমাদের এত পরিচিত হয়ে উঠেছিল যে, আমরা নিজেদের মধ্যে যখন তাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতাম, তখন তাদের নাম ধরেও ডাকতাম। তারপর আরো পরিচিত হয়ে উঠলে শ্রীমতী বা শ্রী ছাড়াই তাদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছিলাম, যদিও এটা অভদ্র ব্যাপার। অবিশ্যি, সেগুলো তাদের নিজেদের নাম ছিল না। আমাদের দেওয়া নামেই আমরা তাদের ডাকতাম! যেমন, আলেকজাণ্ডার রবিনসন, শ্রীমতী অ্যাডালাইন রবিনসন, কর্ণেল জ্যাকব ম্যাকডুগাল, শ্রীমতী হ্যারিয়েট ম্যাকডুগাল, জজ জেরিমিয়া বাটলার আর শ্রীমান বুশরড বাটলার। তাঁরাই ছিলেন দলের প্রধান। রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত ছিলেন তাঁরা। কিন্তু যখন আমরা আরো ভালো করে তাঁদের জেনেছিলাম, আরো বেশি করে পছন্দ করছিলাম, তখন শ্রী বা শ্রীমতী কেটে দিয়েছিলাম তাঁদের নামের মাথা থেকে।

তোমরা জান, যতই কোনো মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে তোমরা জড়িয়ে পড়, ততই তোমরা তাদের ঘনিষ্ট হয়ে ওঠো, ততই তারা তোমাদের প্রিয়জন হয়ে ওঠে। মরুযাত্রীরাও এই কারণে আমাদের প্রিয়জন হয়ে উঠেছিল!

যখন তারা তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিয়েছে, আমরাও ঠিক তাদের হাজার দুহাজার ফুট ওপরে বিশ্রাম নিয়েছি। যখন তারা খাবার খেয়েছে, আমরাও আমাদেরটা খেয়েছি। এইভাবেই আমরা দূরে থেকেও ঘনিষ্ট হয়েছিলাম তাদের সাথে।

পরদিন প্রত্যুষে তাদের অন্ত্যেষ্টির জন্যে আমরা উপস্থিত হলাম তাদের সমাধিক্ষেত্রের এগারোশো ফুট ওপরে। কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে শেষ করলাম সেই কাজটা!

আগের বারের মৃত মরুযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমাদের যতটা কষ্ট হয়েছিল, এবারের মৃত মরুযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে তার চেয়ে আমাদের ঢের বেশি কষ্ট হলো। এর কারণ, আগের মরুযাত্রীরা ছিল আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আর তাদের মৃত্যু ঘটেছিল অনেককাল আগে। এবারের মরুযাত্রীদের আমরা জীবন্ত দেখেছি, এবং তাদের মৃত্যুও দেখেছি চোখের সামনে! আমরা ঠিক করলাম, এ-যাত্রায় আর কারোর সাথে ঘনিষ্টতা বা বন্ধুত্ব করবো না! অকারণে দুঃখ-কষ্ট টেনে এনে লাভ কী!

মরুযাত্রীদের কথা বারবার না বলে আমরা থাকতে পারি নে। সব সময় তারা আমাদের স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। আমাদের মন বেদনায় ভিজে ভারী হয়ে উঠছে!

পরদিন সকালে যখন আমাদের ঘুম ভাঙলো, আমাদের বেদনা লাঘব হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ, বালির আরামদায়ক বিছানায় আমাদের ঘুমটা খুব চমৎকার হয়েছিল।

টম জানালো, আমাদের বেলুন-নৌকোয় কুড়ি টন মতন বালি আছে। আর এই বালি মোটেই হেলাফেলার জিনিস নয়। কাজেই বালিগুলো ফেলে দিতে আমাদের মন চাইলো না।

জিম শুধোলো, 'মাস্টার টম, এই বালি কি আমরা দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারি নে! দেশে ফিরতে আমাদের কদ্দিন লাগবে?'

'পথের ওপর তা নির্ভর করছে।' টম বললো।

'দেশে একবস্তা বালির দাম সিকিডলার। আমার মনে হয় কুড়িবস্তা বালি আছে আমাদের সাথে। তাহলে এর দাম কত হবে?'

'পাঁচ ডলার।' টমের মাথায় একটা মতলব এসে গেল। ও আবার বললো, 'এই বালি হচ্ছে অমূল্য সম্পদ। এর দামের কোনো শেষ নেই।'

'বলছো কি, মাস্টার টম!'

'দেখ, লোকে যখন জানবে, এই বালি খাঁটি সাহারা মরুভূমি থেকে আনা, তারা তখুনি একটুখানি পেতে চাইবে। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে আমরা যদি একশিশি বালির জন্যে দশ সেন্ট করে দাম নিই, তাহলে এই নৌকেয় যা বালি আছে, তার দাম পাব প্রায় দশহাজার ডলার।'

টমের কথা শুনে আমি আর জিম তো আনন্দে নেচেই উঠলাম।

টম আবার বলতে লাগলো, 'আমরা যদি বারবার এখান থেকে বালি নিয়ে দেশে যাই, আর সেখানে তা চড়া দামে বিক্রি করি, তাহলে লাল হতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। কেন না, সাহারা থেকে বালি আমদানির কাজে আমাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না।'

আমি বললাম, 'আমরা তাহলে ক্রোসোসের মতন ধনী হব, তাই না, টম?'

'হ্যাঁ। তুমি হয়তো ক্রীসাসের[১] কথা বলতে চেয়েছো, তাই না? এত মূল্যবান

---

১. ক্রীসাস বা ক্রোসাস (৫৯৫—৫৪৬ খৃ. পূ.) ছিলেন লিমিয়ার শেষ রাজা। তাঁর রাজত্বকাল ৫৬০—৫৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ। তাঁর সম্পদ এবং জ্ঞানের কথা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।—অনুবাদক।

সম্পদ পড়ে থাকতেও ঠকবাজ দরবেশ মিছিমিছি হাজার মাইল পথ হেঁটেছিল। আসলে সে যে-উটচালককে অন্ধ করে দিয়েছিল, তার চেয়েও বড়ো অন্ধ ছিল সে নিজে।'

'মাস্টার টম, আমরা তাহলে কত বড়ো ধনী হব ?'

'এখুনি আমি তা বলতে পারবো না। তবে ধনী হওয়াটা খুবই সোজা। প্রায় চল্লিশ লক্ষ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে এই বালি। একশিশির দাম যদি দশসেণ্ট ধরা হয়, মোট দাম কত হবে, তা হিসেব করতে গেলেই আমার মাথা ঘুরে যাবে।'

জিম খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। একটু পরে ও বললো, 'মাস্টার টম, এখান সমস্ত বালি নিয়ে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। তাতে আমাদের ক্ষতি হতে পারে।' ওর কথা শুনেই বোঝা গেল, ওর উত্তেজনায় অনেকটা ভাঁটা এসে গেছে।

টমের উত্তেজনাতেও ভাঁটা এসে গেল। বললো, 'এতে তাহলে কাজ নেই। মতলবটা ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'কেন, টম ?'

'ট্যাক্সো দেওয়ার জন্যে।'

আমি বা জিম ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। আমি শুধোলাম, 'টম, আমাদের ট্যাক্সো দিতে হবে কেন ? অনেক লোকেই তো ব্যবসা করে।'

ও বললো, 'আমি সে-ট্যাক্সোর কথা বলছি নে। আমি বলছি বহির্বাণিজ্য শুল্কর কথা। যখুনি এই বালি নিয়ে একটা দেশে প্রবেশ করবে, সেখানে একটা কাস্টম-হাউস দেখতে পাবে। সরকারী লোকেরা এসে তোমাদের জিনিসপত্র দেখবে, আর মোটা অঙ্কের ট্যাক্স ধরবে। সেটাকেই শুল্ক বলে। কেন না, তাদের ডিউটি হচ্ছে ট্যাক্স বসানো। যদি তুমি ঐ শুল্ক না দাও, তারা তোমার কাছ থেকে বালি কেড়ে নেবে। এখন আমরা যে-পথে যেতে চাই, সে-পথে গেলে মিশর, আরব, ভারত প্রভৃতি দেশ পার হতে হবে, আর সেসব দেশকেও আমাদের ডিউটি দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'কেন টম, আমরা যদি না নেমে সোজা ঐ-সব দেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাই, তারা আমাদের থামাবে কী করে ?'

টম দুঃখিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হাক ফিন, তুমি কি মনে কর সেটা ঠিক কাজ হবে ?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না দেখে ও আবার বললো, 'যদি আমরা যে পথে

এসেছি, সে-পথেই ফিরে যাই নিউ-ইয়র্ক কাস্টম-হাউস আমাদের ধরবে। তারা আমাদের দফা রফা করে ছেড়ে দেবে।'

'কেন ?'

'ধর, তারা চায় না কেউ সাহারা মরুভূমির বালি আমেরিকায় নিয়ে আসুক। তাদের ইচ্ছের বাইরে যদি কেউ এই বালি সেখানে নিয়ে যায়, তারা হয়তো ডিউটি ধরবে দামের চোদ্দ গুণ বেশী।'

আমি বললাম, 'টম সয়্যার, তোমার কথার কোনো মানেই হয় না।'

'হাক ফিন, আমাকে আগে কথাটা শেষ করতে দাও। তারপর দোষ ধরো।'

'আমি দুঃখিত। বলে যাও।'

জিম বললো, 'আমরা যাকিছু নিয়ে যাব, সবকিছুর ওপর তারা ডিউটি ধরবে ?'

টম বললো, 'ধরবেই তো।'

'মাস্টার টম, ভগবানের আশীর্বাদ কি মূল্যবান জিনিস নয় ?'

'হ্যাঁ, অনেকের মতে সেটা মূল্যবান জিনিস।'

'ধর্মযাজকরা কি ধর্মমঞ্চে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্যে ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন-না ?'

'করেন।'

'সেই আশীর্বাদ কোত্থেকে আসে ?'

'স্বর্গ থেকে।'

'ঠিক বলেছো, এই আশীর্বাদ আসে স্বর্গ থেকে। আর সেই স্বর্গ হচ্ছে একটা বিদেশ। তাহলে বল, তারা কি সেই আশীর্বাদের ওপরেও ট্যাক্স বসায় ?'

'না, তারা তা বসায় না।'

'তারা তা না বসালে বালির ওপরেও তারা ট্যাক্স বসাবে না। কেন না, লোকের কাছে এই বালি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতনই মূল্যবান বস্তু।'

টম সয়্যার জিমের যুক্তিতে কাত হয়েও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো এই বলে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ভগবানের আশীর্বাদের ওপর ট্যাক্স বসাতে ভুলে গেছে! শুধু ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া অন্য প্রতিটি বিদেশী জিনিসের ওপরেই তারা ট্যাক্স বসিয়েছে। কংগ্রেসের পরের অধিবেশনে নিশ্চয়ই তারা সেই ভুলটা সংশোধন করে নেবে!

সাহারার বালি আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারবো না জেনে আমার আর জিমের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। টম আমাদের এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, ও আরেকটা লাভজনক বিষয়ের কথা ভাববে। কিন্তু আমরা ওর কথা বিশ্বাস

করতে পারলাম না। সাহারার বালির চেয়ে বড়ো কারবার আর কিছু হতে পারে না বলেই আমাদের ধারণা। এটা ভাবতেও কষ্ট হয়, একটু আগেই আমরা এত ধনী হয়ে পড়েছিলাম যে, একটা আস্ত দেশ পর্যন্ত আমরা কিনে নিতে পারতাম! আর পরমুহূর্তেই আমরা হয়ে পড়লাম নিতান্ত দরিদ্র! অবিশ্যি সাহারার বালি এখনো আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে! একটু আগে এই বালি কত সুন্দর লাগছিল, সোনা আর হীরের মতন! কিন্তু এখন এ-কে চোখে দেখতেও ভীষণ খারাপ লাগছে! টম আর জিমও নিশ্চয়ই আমার মতনই ভাবছে। এটা বুঝলাম, যখন আমি বেলুন-নৌকো থেকে বালিগুলো ফেলে দেওয়ার প্রস্তাব করলাম। প্রস্তাবটা ওরা সানন্দে লুফে নিল!

কাজটা ভীষণ কঠিন ছিল বলে শরীর-সামর্থ অনুসারে টম এটা ভাগাভাগি করে দিল। টম বললো, আমি আর ও মিলে পাঁচভাগের একভাগ বালি পরিষ্কার করবো, আর জিম একাই পরিষ্কার করবে পাঁচভাগের চারভাগ।

ব্যবস্থাটা জিমের পুরোপুরি পছন্দ হলো না। ও বললো, 'আমি যদিও তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী, আর আমার ভাগের কাজটা করতে যদিও আমার আপত্তিও নেই, তবু বলছি, ভাগাভাগিটা ঠিক হয় নি।'

'জিম, আমি অতটা ভাবিনি। ঠিক আছে, তুই আগে হাত লাগা, তারপর আমরা দেখছি।'

জিম জানালো, আমি আর টম যদি প্রত্যেকে দশভাগের একভাগ করে পরিষ্কার করি, তবেই ভাগাভাগিটা ঠিক হয়। টম তখন কৌতুক মাখানো হাসি হেসে বল্‌লো, তাতে জিম যদি সন্তুষ্ট হয়, আমাদের অসন্তুষ্টির কোনো কারণ নেই!

টম তখন আমাদের জন্যে দশভাগের দুভাগ রেখে বাকি অংশটা জিমের জন্য ছেড়ে দিল। ভাগের পার্থক্যটা দেখে জিম বললো, সময় মতন কথা বলে ও যে আগের ব্যবস্থাটা পাল্টাতে পেরেছে এতেই ও মহা খুসি! বোকারাম আর কাকে বলে!

এরপর আমরা কাজে লেগে গেলাম। একে বালিটা ছিল ভীষণ গরম, তার ওপর কাজটাও ছিল খুব পরিশ্রমের। কাজেই আমাদের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় উঠে যেতে হলো। টম আর আমি কাজ আরম্ভ করলাম। একজন কাজ করি তো আরেকজন বিশ্রাম নিই, এভাবে চললো আমাদের কাজ। কিন্তু বেচারা জিমকে বিশ্রাম দেওয়ার মতন কেউই নেই! প্রচণ্ড মেহনত করে ওর অংশটা ও পরিষ্কার করে চললো। আমি আর টম যতটা না কাজ করলাম, তার চেয়ে হাসলাম অনেক বেশি। জিম যখন আমাদের হাসির কারণ জানতে চাইলো, তখন যা মাথায় এলো, বানিয়ে বানিয়ে তাই-ই বলে চললাম। আমাদের ভাগের কাজ

যখন শেষ হলো, তখন আমি আর টম প্রায় মরে গেছি ? তবে কাজের জন্যে নয়, হাসির জন্যে। জিমও প্রায় মারা পড়ার দাখিল, তবে কাজ করে। আমরা তখন জিমকে বিশ্রাম দিয়ে ওর ভাগের কাজটা করতে লাগলাম। ও তখন ঘাম মুছতে মুছতে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, ওর মতন একজন সামান্য নিগ্রোর প্রতি আমাদের এই সদাশয়তা ও কখনোই ভুলবে না। ও এরকম ভাবেই কৃতজ্ঞতা জানায়। ওর মধ্যে কেউ যদি সামান্য একটুও কাজ করে, কৃতজ্ঞতায় ও গলে পড়ে। ও বাইরেই শুধু নিগ্রো, কালো, ভেতরে ও আমাদের চেয়েও বেশী সাদা !

অবরুদ্ধ জিম

আমরা এরপর দুচারবার বালিভর্তি খাবার খেতে বাধ্য হলাম। কিন্তু খিদের মুখে বালিটালি বিশেষ বুঝতে পারলাম না। কথায় আছে, ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়। আমরা খেলাম বালি, অর্থাৎ বালিভর্তি খাবার।

বেলুনটাকে আমরা উত্তর-পুব মুখে চালাচ্ছিলাম। অবশেষে আমরা মরুভূমির পূর্ব সীমান্তে এসে পৌঁছোলাম। নরম ফিকে লাল আলোয় আমরা দেখতে পেলাম বালিভূমি থেকে অনেকটা দূরে ছোটো ছোটো তিনটে তাঁবুর মতন বস্তু। টম বললো, 'ওগুলো হচ্ছে মিশরের পিরামিড।'

আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠতে চাইলাম। পিরামিডের অনেক ছবি আমি দেখেছি। বহুবার তাদের গল্পও শুনেছি। তবু এ্যাদ্দিন চোখে দেখার কোনো সুযোগ পাইনি। আগে মনে হতো ওটা বুঝি শুধু কল্পনার বস্তু। কিন্তু আজ চলার পথে এভাবে পিরামিড দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে, আনন্দে আমি যেন আর আমাতে রইলাম না ! আশ্চর্যের ব্যাপার এই, কোনো একটা বড়ো রকমের সুন্দর জিনিস সম্বন্ধে যত বেশি বেশি করে লোকের মুখ থেকে তুমি শুনবে, ততই তা ফুলে ফেঁপে এত বৃহদাকার ধারণ করবে, যার সাথে বাস্তবের চেয়ে কল্পনারই মিল থাকে বেশি ! জর্জ ওয়াশিংটনের বেলায় একথা যতটা সত্যি, পিরামিডের বেলাতেও ঠিক ততটাই সত্যি।

একবার আমাদের সানডে স্কুলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁর কাছে ছিল পিরামিডের একটা ছবি। তিনি সেটা আমাদের দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বলেছিলেন, সবচেয়ে বড়ো পিরামিডটা তেরো একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার উচ্চতা প্রায় পাঁচশো ফুট। যেন খাড়া একটা পর্বত ! প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড পাথরের টুকরো দিয়ে সেটা তৈরি। টুকরোগুলো সম্পূর্ণ একই আকারের। সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে উঠে গেছে। তেরো একরে 'একটা বাড়ি! কত বিশাল, বোঝ! খামারবাড়ি হলে তবুও কথা ছিল! বক্তৃতাটা তিনি যদি সানডে স্কুলে না দিতেন, তাহলে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতাম। বাইরে এসে তো নিশ্চয়ই দিতাম। তিনি বলেছিলেন, পিরামিডের নীচে একটা গর্ত আছে। আসলে সেটা সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গপথটা দীর্ঘ, ঢালু। সেই পথে মোমবাতি হাতে নিয়ে সেই পাথুরে পর্বতের পেটে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। পেটটা একটা বিশাল কক্ষ। সেই কক্ষে একটা বিরাট পাথরের সিন্দুকের মধ্যে দর্শন মিলবে এক রাজার, যাঁর বয়েস হচ্ছে চারহাজার বছর!

আমরা পিরামিডগুলোর আরো কাছে আসতে দেখলাম, বালির রাজত্ব শেষ হচ্ছে, আর তার গায়ে গায়ে সুরু হচ্ছে সবুজের রাজত্ব। এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সাপের মতন আঁকাবাঁকা একটা দাগ। টম বললো, ওই দাগটাই হচ্ছে নীলনদ। আমার মন আবার লাফিয়ে উঠলো। কেন না, এই নীলনদও আমার কাছে বাস্তব জিনিস বলে মনে হতো না!

একটা কথা এখানে বলে নিই : তুমি যদি কখনো মরুভূমির উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে তিনহাজার মাইল পাড়ি দাও, সেসময় সেই বালির দিকে তাকালেই তোমার দু-চোখে জল এসে যাবে। বেশ কয়েক সপ্তা এভাবে চলার পর তুমি যদি কোনো সবুজ দেশ দেখতে পাও, সেটা তোমার কাছে নিজের বাড়ি আর স্বর্গের মতনই মনে হবে! আর সেই সবুজের দিকে তাকালেও তোমার দু-চোখ আবার জলে ভরে যাবে!

আমার বেলাতেও ঠিক এরকমই ঘটলো। জিমের বেলাতেও।

জিমের দু-চোখ জলে ভরে উঠতেই ও বিশ্বাস করলো, এটাই হচ্ছে মিশর দেশ। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও-দেশে প্রবেশ করবে না ও। হাঁটুগেড়ে বসে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেললো, তারপর বললো, একজন অধম নিগ্রোর উচিত না দাঁড়িয়ে বা শুয়ে বা অন্য কোনো ভাবে এরকম একটা মহান্ দেশে প্রবেশ করা, যে-দেশে মোজেস্, যোসেফ, ফ্যারাও আর অন্যান্য মহামানবরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ও হচ্ছে প্রেজবিটীরিয়ান (অর্থাৎ আচার্যপ্রধান গীর্জের সভ্য) আর মোজেস্ও ছিলেন একজন প্রেজবিটীরিয়ান। তাই মোজেসের ওপর ওর ছিল গভীর শ্রদ্ধা।

পিরামিডের দেশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিম বললো, 'মিশর দেশ! মিশর দেশ!! আমি নিজের চোখে দেখবো এই দেশটাকে। আর ওই হচ্ছে সেই নীলনদ! অধম জিম এই পবিত্র দেশটা দেখার উপযুক্ত নয়। কী

সৌভাগ্য !' বলতে বলতে আনন্দে কেঁদে ফেললো জিম।

টম আর জিমের মধ্যে দেশটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। জিমের উত্তেজনার কারণ, দেশটা নানা ঐতিহাসিক ঘটনায় পূর্ণ। যোসেফ, মোজেস আর জ্যাকবের কথা স্মরণ করে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে। টমের উত্তেজনার কারণও সেই ইতিহাস, তবে ওর নিজের লাইনের। নূরউদ্দিন, বদরুদ্দিন এবং যেসব দৈত্যের কাহিনী শ্রোতাদের লোম খাড়া করে দেয়, তাদের কথা বলতে লাগলো টম। 'আরব্য রজনী'-র কিছু গল্প, যাদের অর্ধেক আমার কাছে আষাঢ়ে বলে মনে হয়, সেগুলোও স্মরণ করলো ও।

ভোর থেকেই কুয়াশায় ছেয়ে গেল চারদিক। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম কারণ এ-অবস্থায় যদি আমরা বেলুনে চড়ে এগিয়ে যাই, আমরা হয়ত মিশর দেশের ভেতরে গিয়ে পৌছোবো। ফলে পিরামিডগুলো আমাদের আর দেখা হবে না। তাই আমরা স্থির করলাম, পিরামিডগুলো যেখানে দেখা যাচ্ছে, তার কাছেই এখন থাকবো। তারপর খুব নীচে নেমে গিয়ে সেগুলো ভাল করে দেখবো।

টম বেলুনের হাল ধরলো। আমি নোঙরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। নোঙরটা নামানোর জন্যে। আর জিম বেলুনের ওপর দু-পা ফাঁক করে বসে রইলো, নমস্কার করার ভঙ্গিমায়। দৃষ্টি দিয়ে কুয়াশা ভেদ করতে চাইছে ও। হয়তো ও দেখতে চাইছে, সামনে কোনো বিপদ আছে কিনা !

আমরা সোজা এগিয়ে চললাম। তবে খুব দ্রুত নয়। কুয়াশা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগলো। এত গাঢ় হলো যে, জিমকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। আবছা-ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল ওকে। তার ওপর পরিবেশটাও ছিল ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ। কাজেই খুব ছোটো গলায় কথা বলছিলাম আমরা। ভীষণ উদ্বিগ্ন অবস্থায় কেটে গেল প্রায় একটা ঘণ্টা। তবুও সবকিছু যেন মৃত্যুর মতন নির্বাক-নিস্তব্ধ। আমরা কানগুলো খাড়া করে রইলাম। কিছু শব্দ টব্দ যদি হয়, তা শোনার জন্যে। আর কোনো রকমে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

কুয়াসা সামান্য একটু পাতলা হয়ে আসতেই জিম সভয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তোমার পায়ে পড়ছি, বেলুনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল, মাস্টার টম। ওই দেখো আরব্যরজনী-র সেই সবচেয়ে বড়ো দৈত্যটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে !' এই বলে ও বেলুন-নৌকোর পেছন দিকে পালালো।

বেলুনের গতি থামিয়ে দিল টম। যেই আমরা সম্পূর্ণ থেমে গেলাম, একটা মানুষের বিশাল মাথা দেখতে পেলাম আমি। মাথাটা আমাদের বাড়ির একটা



ঘরের মতন প্রকাণ্ড। মাথাটা দেখেই আমি বেলুন-নৌকোর মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। মিনিট খানেক পরে জ্ঞান ফিরে পেলাম আমি।

ইতিমধ্যে টম বেলুন-নৌকোর একটা আংটা লাগিয়ে দিয়েছে দৈত্যটার নীচের ঠোঁটে! বেলুনটা এর ফলে সোজা হয়ে তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে! নিজের মাথাটাকে পেছন দিকে বেঁকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই ভয়ঙ্কর মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো ও! বাপ রে, কী ডানপিটে সাহসী ছেলে এই টম!

জিম প্রার্থনার ভঙ্গিমার হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছে বিড়বিড় করে, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোচ্ছে না!

আমি দৈত্যটার দিকে আর একবার তাকিয়ে দ্বিতীয়বার অজ্ঞান হয়ে পড়ছি, এমন সময় টম বলে উঠলো, 'ওরে হাঁদারাম, এটা জ্যান্ত নয়। এটার নাম স্ফিংকস।'

কারোর তুলনায় টমকে এত ছোট্ট আগে কখনো দেখিনি। দেখে মনে হচ্ছে দৈত্যটার কাছে ও যেন একটা মাছি।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম দৈত্যটাকে। বুঝলাম এর মাথাটা দেখতে বিশাল হলেও ভয়ঙ্কর নয়, বরং মুখটা দেখে মনে হচ্ছে দৈত্যটা সম্ভ্রান্তবংশীয়। দেখতেও চমৎকার। বেদনায় ভরা মুখ। ও যেন তোমার-আমার কথা ভাবছে না, ভাবছে অন্য কারোর কথা, সুদূর অতীতের কোন ঘটনা! মূর্তিটা লালচে পাথরে তৈরি। ওর নাক আর কানগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে। ফলে ওর মুখটা হয়ে পড়েছে বিকৃত। এই কারণে যে ওকে এখন দেখবে, তারই দুঃখ হবে ওর জন্যে!

আমরা মূর্তিটার সামনে, চারপাশে, মাথার ওপর উঠে দেখলাম। সত্যিই ভারি সুন্দর, তারিফ করার মতন। মনে হচ্ছে এটা একটা পুরুষের মাথা। নারীর মাথাও হতে পারে। একশো পঁচিশ ফুট লম্বা একটা সিংহের শরীরের ওপর মাথাটা বসানো। ওর সামনের দুটো থাবার মাঝখানে রয়েছে একটা সুন্দর ছোট্ট মন্দির। ওর মাথাটা বাদে শরীরের অন্যান্য অংশ শতশত বছর ধরে পোঁতা ছিল বালির নীচে। বছরের সংখ্যা শতশত না হয়ে হাজার হাজারও হতে পারে! দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সম্প্রতি বালি খুঁড়ে ওর শরীরের অন্যান্য অংশসহ মন্দিরটা বের করা হয়েছে। একটা স্টীমবোটকে ঢেকে ফেলতে যতটা বালির দরকার হয়, প্রায় তত বালির দরকার হয়েছিল এই মূর্তিটাকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিতে! অবিশ্যি প্রাকৃতিক কারণেই এটা ঘটেছিল!

আমরা জিমকে দৈত্যটার মাথার ওপর নামিয়ে দিলাম। তারপর ওর হাতে তুলে

দিলাম আমেরিকার জাতীয় পতাকা। এরপর আমরা বেলুনটাকে দৈত্যটার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখতে লাগলাম কেমন দেখায় ওকে।

জিম একেকবার একেক কায়দায় দাঁড়াতে লাগলো। দূর থেকে ওর অঙ্গভঙ্গি দেখে ওকে একটা ব্যাঙের মতন মনে হচ্ছিল।

আমরা আরো দূরে সরে গেলাম। জিম আরে ছোটো হয়ে গেল, কিন্তু স্ফিংকসকে আরো সুন্দর দেখাতে লাগলো। তারপর এমন দূরত্বে আমরা গিয়ে পৌছোলাম' যেখান থেকে জিমকে দেখাচ্ছিল গম্বুজের ওপর একটা বিন্দুর মতন!

তারপর আমরা আরো—আরো দূরে উড়ে গেলাম। ফলে জিমকে আর দেখা গেল না। কিন্তু মূর্তিটা যেন এ-সময় সবচেয়ে সুন্দর হয়ে উঠলো! নীলনদের উপত্যকায় মূর্তিটাকে বড়ো শান্ত-স্থির-নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো। তার আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। আছে শুধু বালি আর বালি! যেন ভেলভেটের গালিচা বিছানো রয়েছে তার চারধারে!

আমরা এবার থেমে যেয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে ঐ আশ্চর্য মূর্তিটাকে দেখলাম। আমরা দুজনের কেউ একটাও কথা বললাম না। হাজার হাজার বছর ধরে মূর্তিটা ঠিক ওইভাবে দাঁড়িয়ে বিষন্ন বদনে কিছু একটা চিন্তা করছে। কিন্তু কি যে ও চিন্তা করছে, তা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি!

অবশেষে আমি দূরবীণটা চোখে লাগালাম। এ-সময় নীচে তাকিয়ে দেখলাম কালো কালো কিছু পোকা বালির কার্পেটের ওপর ঘোরাফেরা করছে। কয়েকটা পোকা আবার মূর্তিটার পেছন দিক দিয়ে ওপরে ওঠারও চেষ্টা করছে। দু-একবার সাদা ধোঁয়ার ছোটোছোটো ফুৎকার আমার নজরে এলো। আমি টমকে ব্যাপারটা দেখতে বললাম।

টম দেখেই বলে উঠলো, 'ওগুলো মনে হয় ছারপোকা।' একটু থেমে ও আবার বললো, 'না, ছারপোকা না। আমার বিশ্বাস ওগুলো মানুষ। হ্যাঁ, ওরা মানুষ! মানুষ আর ঘোড়া দুই-ই আছে! একটা লম্বা মইয়ের সাহায্যে ওরা স্ফিংকস-এর পেছন দিক দিয়ে ওপরে উঠছে! ওই যে আবার ধোঁয়ার ফুৎকার! নিশ্চয়ই গুলি ছুঁড়ছে! হাক, ওরা জিমকে আক্রমণ করছে!'

আমরা সময় নষ্ট না করে বেলুনটাকে দ্রুতবেগে চালিয়ে মূর্তিটার কাছে নিয়ে এলাম। আমাদের দেখেই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো বা যার যেদিকে সুবিধে হলো, সে সেদিকেই পালাতে লাগলো। যারা জিমকে ধরার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল, তারা তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে নীচে পড়ে গেল। আমরা জিমের কাছে গিয়ে দেখলাম, বেচারা জিম মরার মতন চুপ করে শুয়ে আছে মূর্তিটার

মাথার ওপর। ও জানালো, লোকগুলো চারদিক থেকে গুলিবৃষ্টি করছিল! কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল, একটাও ওর গায়ে লাগে নি। যখন তারা দেখলো, ও উঠে দাঁড়াচ্ছে না, ফলে গুলিও ওর গায়ে লাগছে না, তখন তারা মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো। জিম এ-সময় ধরেই নিয়েছিল, আমরা যদি তাড়াতাড়ি এসে ওকে উদ্ধার না করি, ওকে তারা শেষ করে দেবে।

টম রুষ্ট হয়ে ওকে শুধোলো, 'তুই কেন ঝাণ্ডাটা দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাম করে তাদের তফাৎ যাওয়ার জন্যে আদেশ করিস নি?'

জিম বললো, 'আমি তা করেছিলাম। কিন্তু মাস্টার টম, তাতে কোনো ফল হয় নি।'

টম জানালো ওয়াশিংটনে গিয়ে ও কর্তাদের বলবে, 'আমাদের ঝাণ্ডার অপমান করেছে ওই লোকগুলো। আপনারা ব্যাপারটা দেখুন। আক্রমণকারীদের এ-জন্যে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে। ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।'

জিম বললো, 'মাস্টার টম, ক্ষতিপূরণটা কী জিনিস?'

'নগদ টাকা।'

'এই টাকা কে পাবে, মাস্টার টম?'

'কেন? আমরা পাব।'

'দুঃখ-প্রকাশ করবে কার কাছে?'

'যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। নতুবা আমরা যা খুশি ব্যবস্থা নিতে পারি। আমাদের কাছেও তারা দুঃখপ্রকাশ করতে পারে। টাকাটা আমাদের দিলে সরকারকে আমরা সেই টাকাটা নিয়ে গিয়ে দিতে পারি। অবিশ্যি আমাদের ইচ্ছের ওপরেই তা নির্ভর করে।'

'মাস্টার টম, ওরা কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে?'

'এক্ষেত্রে প্রত্যেককে কমপক্ষে তিনডলার করে দিতে হবে। আমি জানি নে, তার বেশিও হতে পারে।'

'মাস্টার টম, তাহলে আমরা শুধু টাকাটাই নেব। দুঃখপ্রকাশের ব্যাপারে আমরা নেই। তোমারও কি তাই ইচ্ছে নয়? হাক, তুমি কী বলছো?'

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা শুধু টাকাটাই নেব।

আমি টমকে শুধোলাম, 'কোনো দেশ যদি ভুল করে, তাহলে কি সব সময় দুঃখপ্রকাশ করে?'

টম বললো, 'করে। তবে কেবল ছোটো দেশগুলোই তা করে। কেন না, এ-সব দেশের গায়ের জোর কম।'

আমরা ঘুরে ঘুরে পিরামিডগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলাম। একসময় ওপরে উড়ে গিয়ে সবচেয়ে উঁচু আর বড়ো পিরামিডটার চুড়োর ঠিক উপরে গিয়ে থামলাম আমরা। এ-সময় দেখলাম, আমাদের সানডে স্কুলের স্যার পিরামিড সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা হুবহু ঠিক। চারজোড়া সিঁড়ি চওড়া আকারে আরম্ভ হয়েছে নীচে, চারধারে। তারপর তা ক্রমশ ঢালু হয়ে উঠে এসেছে ওপর দিকে। তারপর চূড়াতে এসে একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তোমরা সচরাচর যে রকম সিঁড়ি বেয়ে ওঠ, এই সিঁড়িগুলো কিন্তু সেরকম না। এর প্রত্যেকটা ধাপের উচ্চতা হবে তোমার থুতনি পর্যন্ত। কেউ যদি পেছন থেকে ঠেলে তোমাকে তুলে দেয়, তবেই কেবল তুমি উঠতে পারবে।

অন্য পিরামিডদুটো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমরা এত উঁচুতে আছি যে, যেসব লোক নীচে চরে বেড়াচ্ছে, তাদের দেখে মনে হচ্ছে, কতকগুলো ছারপোকা যেন মাটির ওপর চরে বেড়াচ্ছে!

আনন্দে আত্মহারা হয়ে টম ইতিহাস উগরোতে লাগলো। ও বলে উঠলো, 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, যেখান থেকে রাজকুমার ব্রোঞ্জের ঘোড়ায় চড়ে আকাশে উড়ে গিয়েছিলেন, আমরা ঠিক সেখানটাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি! আরব্য উপন্যাসে এটা আছে। কেউ একজন রাজকুমারকে ঘোড়াটা দিয়েছিল। ঘোড়াটার কাঁধে ছিল একটা কীলক বা গোঁজ। রাজকুমার ঘোড়াটায় চড়ে একটা পাখির মতন করে আকাশে উড়ে বেড়িয়েছিলেন। সারা পৃথিবী তিনি চক্কর দিয়েছিলেন। কীলক বা গোঁজটা ঘুরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে-ওপরে-নীচে যেখানে খুশি সেখানে তিনি ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে বা উড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিলেন। যেখানে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেখানেই তিনি গিয়েছিলেন। নেমেছিলেনও।'

টম যখন রাজকুমারের আকাশে ওড়ার গল্পটা বলছিল, আমি আর জিম গল্পটা আজগুবি ভেবে চুপ করে ছিলাম। টম গল্প শেষ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোলো, 'কী ভাবছো?'

আমি বলালম, 'টম সয়্যার, গল্পটা তুমিও নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না, তাই না?'

'বিশ্বাস করবো না কেন?'

'ওরকম কিছু ঘটতে পারে না বলে।'

'কেন ঘটতে পারে না?'

'কেন ঘটতে পারে, সেটাই বল।'

'এই বেলুনটাই তো একটা উদাহরণ। এটাই বলে দিচ্ছে ওরকম ঘটনা ঘটতে পারে।'

'মোটেই না।'

'মোটেই না? তোমার মতন বোকারাম আমি ত্রিভুবনে একটাও দেখিনি! এই বেলুন আর ব্রোঞ্জের ঘোড়াটা দুটো নামে একই জিনিস হতে পারে না?'

'না, তা পারে না। এটা হচ্ছে বেলুন, আর সেটা ছিল ঘোড়া। দুটো আলাদা জিনিস। এর পরে হয়তো তুমি বলে বসবে একটা বাড়ি আর একটা গোরু একই জিনিস!'

'হাক্ ঠিকই বলেছে।' জিম আমাকে সমর্থন করলো।

'জিম, থাম্। কী নিয়ে কথা হচ্ছে, তা তুই জানিস? হাকও জানে না। হাক্, আমি তোমাকে ব্যাপারটা জলের মতন বুঝিয়ে দিচ্ছি। আকৃতিতে জিনিসদুটো আলাদা ঠিকই, কিন্তু কলাকৌশল দুটোরই এক। বুঝতে পারলে না?'

'কলাকৌশলের কথা ধরলে একটা বেলুন যা পারবে, একটা ঘোড়া তা পারবে না।'

'তুমি জিনিসটাই ধরতে পার নি। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা কি আকাশে উড়তে পারছি নে?'

'পারছি।'

'ঠিক আছে। আমরা কি যখন খুশি ওপরে বা নীচে যেতে পারছি নে?'

'পারছি।'

'আমরা কি যেদিকে খুশি বেলুনটাকে চালাতে পারছি নে?'

'পারছি।'

'আমরা কি যেখানে খুশি সেখানে এটাকে নামাতে পারি নে?'

'পারি।'

'আমরা কিভাবে বেলুনটাকে চালাই?'

'স্রেফ বোতাম টিপে।'

'এখন মনে হচ্ছে জিনিসটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। ঘোড়াটার বেলায় বোতাম না টিপে গোঁজটা ঘুরিয়ে সেটাকে চালানো হয়েছিল। আমরা টিপি বোতাম। রাজকুমার ঘুরিয়েছিলেন গোঁজ। দুটোর মধ্যে একচুলও পার্থক্য নেই। আশাকরি ব্যাপারটা এখন তোমাদের মাথায় ঢুকেছে।' কথা থামিয়ে আমার আর জিমের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো ও। তারপর ফের বললো, 'হাক ফিন, এখনো কি ব্যাপারটা তোমার বোধগম্য হয়নি?'

আমি বললাম, 'টম সয়্যার, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'কর।' বললো টম।

জিম এসময় কানদুটো খাড়া করে ফেললো।

আমি শুরু করলাম, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, পুরো জিনিসটা এসে দাঁড়িয়েছে বোতাম আর গোঁজে। কিন্তু বোতামের আকার একরকম, গোঁজের আকার আরেক রকম। এতে কি কিছু যায় আসে না?'

'না, এতে কিছু যায় আসে না। কেন না, দুটোরই শক্তি একরকম।'

'ঠিক আছে। একটা জ্বলন্ত মোমবাতি আর একটা দেশলাইকাঠির শক্তি বলতে তুমি কী বোঝ?'

'তাদের শক্তি হচ্ছে আগুন।'

'দুটোরই কি একই শক্তি?'

'হ্যাঁ, একই শক্তি।'

'ঠিক আছে। ধর, আমি একটা ছুতোরের দোকানে দেশলাইকাঠি ঠুকে আগুন ধরিয়ে দিলাম। ছুতোরের দোকানের তখন কী অবস্থা হবে?'

'পুড়ে যাবে।'

'এখন ধর, একটা জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে এই পিরামিডটায় আগুন ধরালাম।' এটা কি পুড়ে যাবে?'

'কক্ষণো পুড়বে না।'

'দুটোতেই আগুন ধরালাম। কিন্তু একটা পুড়বে, আরেকটা পুড়বে না কেন?'

'কারণ পিরামিড পুড়তে পারে না।'

'তাহলে বল, একটা ঘোড়া কি উড়তে পারে?'

'হাক এবার মাস্টার টমকে আচ্ছা প্যাঁচে ফেলেছে!' জিম এই বলে হেসে ফেললো। ও আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর এতই হাসি পেয়েছিল যে, হাসি ছাড়া ওর মুখ দিয়ে আর কিচ্ছু বেরোলো না।

টমের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে প্যাঁচে ফেলে আমিও চুপ করে গেলাম। কেন না, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা বসানো আমার স্বভাবে নেই!

টমের পাইপ আনতে যাওয়া

একসময় আমি আর টম জিমের ওপর বেলুনটার দায়িত্ব দিয়ে মাটিতে নেমে পড়লাম। জিমকে বলা হলো পিরামিডের কাছাকাছি জায়গায় বেলুনটাকে আকাশে ভাসিয়ে রাখতে।

আমি আর টম মোমবাতি হাতে নিয়ে কয়েকজন আরবের সাথে গর্ত দিয়ে

পিরামিডের সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়লাম। পিরামিডের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দেখতে পেলাম একটি কক্ষ এবং পাথরের তৈরী একটি সিন্দুক। এই সিন্দুকটার মধ্যেই থাকতেন রাজা। সানডে স্কুলের স্যার এরকমই বলেছিলেন। কিন্তু সেই রাজাকে এখন সিন্দুকে দেখতে পেলাম না। তিনি এখান থেকে উধাও হয়ে গেছেন! কেউ নিশ্চয়ই লোপাট করেছে তাঁকে!

আমার কিন্তু পিরামিডের ভেতরে এসে মোটেই ভাল লাগলো না। ভেতরটাকে কেবলই ভূতুড়ে জায়গা বলে আমার মনে হতে লাগলো। ভয়ে আমার গায়ের ভেতরটা ছমছম করে উঠলো! এখানকার ভূত আবার যে ইতিহাসখ্যাত!

পিরামিডের বাইরে এসে আমরা হাল্কা হলাম। বাইরে কয়েকটা ছোটো ছোটো গাধা দেখতে পেলাম। আমি একটায় উঠলাম, টম উঠলো আরেকটায়। আমাদের গন্তব্যস্থান এখন কায়রো।

কিছুটা পথ গাধায়, কিছুটা পথ নৌকোয়, আবার কিছুটা পথ গাধায়, এই করে শেষ পর্যন্ত মিশরের রাজধানী কায়রোয় এসে পৌছোলাম। এত মসৃণ, এত সুন্দর পথ আমি এর আগে কোথাও দেখি নি! পথের দুধারে আছে লম্বা লম্বা খেজুরগাছের সারি। উলঙ্গ শিশুদের দেখা যাচ্ছে সবখানে। এখানকার অধিবাসী-দের গায়ের রঙ তামার মতন লাল। এদের শক্তিশালী চেহারা দেখতে ভারি সুন্দর।

শহরের মধ্যিখানটা একটা কৌতূহলের বস্তু। পথগুলো অপ্রশস্ত। গলির মতন। সেগুলো আবার পথচলতি মানুষের ভিড়ে গিজগিজ করছে।

পুরুষদের মাথায় পাগড়ি আর মেয়েদের মুখ ঘোমটার মতন পর্দা দিয়ে ঢাকা। মানুষ আর উট পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। গোলমাল-চেঁচামেচিতে পথগুলো মুখর। এখানকার মানুষদের রঙীন পোশাকের চাকচিক্য এবং তাদের গলাবাজিতে যথেষ্ট বৈশিষ্ট আছে বলে আমার মনে হলো।

দোকানগুলো খুবই ছোটোখাটো। তবে খদ্দেরদের ভেতরে ঢোকার দরকার হয় না। দোকানদাররা প্রায় রাস্তার ওপরে বসেই গড়গড়ার নল টানছে। নলগুলো দেখতে সাপের মতন লম্বা লম্বা! ভারবাহী উটগুলো পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দোকানদারদের ছুঁয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ দেখা গেল কেউ একজন বিশিষ্ট মানুষ পথ দিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁর আগে আগে আসছে সুন্দর পোশাকপরা কিছু লোক। তাদের হাতে রয়েছে পরিচয়জ্ঞাপক পতাকা লাগানো লাঠি। তারা পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে পথচারীদের।

একসময় সুলতানকেও আসতে দেখা গেল। তিনি আসছেন চমৎকার সাজানো একটা ঘোড়ায় চড়ে। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ সত্যিই রাজকীয়। প্রত্যেকে উপুড় হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতে লাগলো। আমি এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, শুয়ে পড়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতে ভুলেই গিয়েছিলাম! তবে একজন বরকন্দাজ আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিল।

শহরে অনেক উপাসনাগার রয়েছে। এসব উপাসনাগারে রবিবার পালন করা হয় না। পালন করা হয় শুক্‌রবার। উপাসনাগারের ভেতরে যেতে হলে জুতো বাইরে খুলে রাখতে হয়। ভেতরে পুরুষ আর বালকরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পাথরের মেঝের ওপর বসে গ্রন্থপাঠ শুনছে। টম জানালো গ্রন্থটির নাম হচ্ছে কোরাণ। এই কোরাণ আমাদের বাইবেলের মতনই পবিত্র।

এত বিশাল বিশাল উপাসনাগার আমি আগে কোথাও দেখিনি। উপাসনাগার-গুলো ছিল খুবই উঁচু আর নিখুঁতভাবে অলঙ্কৃত। আমাদের গাঁয়ের উপাসনাগারটা এদের তুলনায় তুচ্ছ। যদি এখানকার একটা উপাসনাগার তুলে নিয়ে গিয়ে আমাদের গাঁয়ে বসানো যেতো, সেখানকার লোকে নিশ্চয়ই এটাকে বিশাল প্রাসাদ বলে ভুল করতো! আমি অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম একটা উপসনাগারের মাথার দিকে।

আমার খুব ইচ্ছে হলো একজন দরবেশের সাথে আলাপ করার। কেন না, যে-দরবেশটি উটচালককে অন্ধ করে দিয়েছিলেন, তিনি এখনো আমার মনের ভেতর বাসা বেঁধে আছেন।

উপাসনাগারের মতন দেখতে একটা জায়গায় আমরা বেশ কয়েকজন দরবেশের দর্শন পেলাম। তাঁরা হচ্ছেন পাক খাওয়া দরবেশ। তাঁদের পাক খেতেও দেখলাম। তাঁদের মাথায় অদ্ভুত দেখতে টুপি। তাঁদের পরনেও বিচিত্র বেশ। ঘাঘড়ার মতন দেখতে। পরে জেনেছি এগুলোকে বলে লুঙি। তাঁরা কেবলই পাক খাচ্ছেন, লাট্টুর মতন করে। আমি এরকম দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম।

দরবেশের লুঙিগুলো ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। আমি অবাক হয়ে সে-দিকেই তাকিয়ে আছি।

টম জানালো দরবেশরা সবাই মুসলমান। আমি জানতে চাইলাম, 'মুসলমান কী?'

টম বললো, 'যারা গির্জেয় সভ্য নয়, আর যারা গির্জেয় যায় না, তারাই মুসলমান।'

টমের কথা মানতে গেলে এটাও মানতে হয়, মিসৌরিতে এমন অনেক লোক আছে, যারা গির্জেয় যায় না, তারাও তাহলে মুসলমান! এরকম কথা আর কারোর মুখে আমি শুনি নি।

কায়রোর দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর অর্ধেকও আমার দেখা হলো না। কেন না, টম শুধু ঐতিহাসিক স্থানগুলোই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দুর্ভিক্ষের আগে যোসেফ যে-শস্যাগারে শস্য মজুত করে রেখেছিলেন, সেটা খুঁজে বের করতে আমাদের শরীর দিয়ে কাল ঘাম ছুটে গিয়েছিল! যখন আমরা এটা খুঁজে পেলাম, তখন এটা দর্শনীয় বলে আমার কাছে মনেই হলো না। শস্যাগারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু টম তার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়ে খুব খুশি হলো। খুব হৈচৈ করে উঠলো! কিভাবে টম জায়গাটা খুঁজে পেলো, তা নিয়ে নিশ্চয়ই একটা গল্প হয়। ওর মতন করিতকর্মা ছেলে জগতে হয়তো আর একটাও নেই!

এরপর আমরা খুঁজতে লাগলাম সেই বাড়িটা, যেখানে থাকতো সেই ছেলেটা, যার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে 'আরব্যরজনী'তে। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু বাড়িটার কোনো পাত্তাই পেলাম না। আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম টম আজকের মতন কাজটা মুলতুবি রাখবে। আমি চাইছিলাম কাল আবার এসে এমন একটা লোকের সাহায্য নিতে, যে-লোক জায়গাটা চেনে, আর মিসৌরির ভাষাও জানে। তাহলে সে বুঝতে পারবে আমরা কী চাই, আর সে তখন আমাদের চাহিদা সহজেই পূরণ করতে পারবে। সোজা আমাদের নিয়ে যেতে পারবে 'আরব্যরজনী'র সেই বাড়িটায়।

কিন্তু শ্রীমান টম আমার প্রস্তাব নাকচ করে দিল। কারোর সাহায্য না নিয়ে ও নিজেই চায় জায়গাটা আবিষ্কার করতে। আর কাল না, আজই ও আবিষ্কার করবে! আজকের কাজ কালকের জন্যে ফেলে রাখা ওর পছন্দ না।

অতএব আবিষ্কারের কাজটা আমাদের চালিয়ে যেতেই হলো। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়েই। তবে ক্লান্তি আর অবসাদ ছিল শুধু আমারই নিজস্ব ব্যাপার! অবশেষে সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটলো। টম সয়্যার সত্যিই আবিষ্কার করে ফেললো বাড়িটা! বাড়ি বলতে কিছু নেই, আছে শুধু তার একটুরো স্মৃতিচিহ্ন, অর্থাৎ ইট! মিসৌরির একটা গেঁয়ো ছেলের পক্ষে কাজটা এত কঠিন যে, কেউ এটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিলেও আমি তাঁকে দোষ দিতে পারি নে। কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল! আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না, যদি নিজের চোখে না দেখতাম। ও যখন ইটটা দেখেই বাড়িটা চিনে ফেললো, তখন আমি ওর পাশেই ছিলাম। ওর চিনতে পারার অলৌকিক ক্ষমতাকে আমি কী বলবো,

জ্ঞান না গুণ?

জ্ঞানই বলি, আর গুণই বলি, আমি কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভেবেছি। জ্ঞান, গুণ দুই-ই আছে। এই দুয়ের বলে ইটের টুকরোটা আবিষ্কার করেই সেটা পকেটের মধ্যে পুরে নিল টম। উদ্দেশ্য, সেটার ওপর নিজের নাম লিখে কোনো যাদুঘরে দান করা!

গোপনে একটা মজার কথা বলি : পরে দেশে ফিরে ওর পকেট থেকে এই ইটের টুকরোটা বের করে পরে একই রকম দেখতে অন্য একটা ইটের টুকরো ওর পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। ও কিন্তু তখন পার্থক্যটা ধরতে পারে নি! আশা করি এখন শ্রীমান টমের জ্ঞান-গুণের ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি তোমাদের। জ্ঞান বলতে আমি বলতে চেয়েছি অর্জিত বিদ্যা, আর গুণ বলতে বোঝাতে চেয়েছি সহজাত বিদ্যা বা ক্ষমতাকে। এখন নিশ্চয়ই আরো পরিষ্কার সেটা করে বোঝাতে পেরেছি!

আমরা পিরামিডের কাছে ফিরে আসতেই জিম বেলুনটাকে নীচে নামিয়ে আনলো। আমরা বেলুনে উঠে পড়লাম। এমন সময় সেখানে দেখতে পেলাম একজন স্থানীয় যুবককে আলাপ করলাম তার সাথে।

যুবকটির মাথায় পরা রয়েছে লাল রঙের একটা আঁটো টুপি। টুপির ওপর রেশমের থোবা। ওর পরনে রয়েছে নীলরঙের সুন্দর রেশমি জ্যাকেট আর ট্রাউজার। ওর কোমরে জড়ানো রয়েছে একটা ফেটি, তাতে বাঁধা রয়েছে পিস্তল। ও ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ও চায় আমাদের পথপ্রদর্শক হতে। দিনে আধ ডলার পারিশ্রমিক দিলেই চলবে। ও আমাদের নিয়ে যাবে মক্কায়, মদিনায়, মধ্য আফ্রিকায়, যে-কোনো জায়গায়! ওকে আমরা গাইড হিসাবে নিয়োগ করলাম। তারপর ওকে নিয়ে বেলুনে চড়ে এগিয়ে চললাম।

ডিনার খেতে খেতে আমরা চলে এলাম সেই জায়গাটায়, যেখানে ফ্যারাওয়ের তাড়া খেয়ে ইজরায়েলীরা লোহিত সাগর পার হয়েছিল। আমরা জায়গাটা ভাল করে দেখতে লাগলাম। জিম তো আরো ভাল করে দেখলো।

জিম জানালো, ঘটনাটা যা ঘটেছিল, ও যেন এখন তার সবটাই দেখতে পাচ্ছে! ও দেখতে পাচ্ছে, ইজরায়েলীরা জলের দু-দেয়ালের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অনেক দূরে মিশরীয়দের ছুটে আসতে দেখা যাচ্ছে। ইজরায়েলীরা যেই জলের দু-দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল, অমনি মিশরীয়রা সেখানে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে জলের দুই দেয়াল এক হয়ে গেল! সব ক-জন মিশরীয় ডুবে মরলো!

আমরা আবার এগোতে লাগলাম। সিনাই পর্বতের ওপরে উড়ে এলাম আমরা। মোজেস যেখানে পাথরের টেবিল ভেঙেছিলেন, ইজরায়েলী শিশুরা যে-সমতলভূমিতে তাঁবু খাটিয়েছিল, সোনার বাছুরকে যেখানে তারা পুজো করেছিল, সবই দেখলাম। আমি যেমন আমাদের গাঁয়ের সব জায়গা চিনি, আমাদের পথপ্রদর্শকও সেরকম এখানকার সব জায়গা চেনে দেখছি! ফলে বেশ মজা লাগছিল জায়গাগুলো দেখতে।

কিন্তু এ-সময় হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ফলে আমাদের পৃথিবী-পরিক্রমা এখনকার মতো স্থগিত রাখতে হলো।

টমের পাইপটা ছিল পুরানো। হঠাৎ সেটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। সুতোর বাঁধন ব্যাণ্ডেজেও কাজ হলো না। প্রফেসরের একটা পাইপ ছিল। কিন্তু সেটায় নাকি টম তামাক খেয়ে সুখ পায় না! আমার পাইপটা ওকে দিতে চাইলাম। কিন্তু সেটাও নিতে চাইল না ও।

সুতরাং সমস্যা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠলো। টম জেদ ধরলো, যেখান থেকেই হোক, ওর পুরানো পাইপটার মতন একটা পাইপ ওর চাই-ই চাই। মিশরে, আরবে, কিংবা এ-অঞ্চলের অন্য কোনো দেশে খোঁজ নিতে হবে। কিন্তু পথপ্রদর্শক অর্থাৎ গাইড জানালো, এ-সব দেশে ওরকম পাইপ মিলবে না।

টম কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো, হঠাৎ ওর মাথায় একটা মতলব এসে গেল। ও বললো, 'আমার আরেকটা কর্নকব পাইপ আছে। সেটাও খুব ভাল। নতুনই বলা চলে। আমাদের গাঁয়ের বাড়ির রান্নাঘরের উনোনের ওপরে যে-আড়াটা আছে, তার উপরে সেটা রাখা আছে। জিম, তুই আর আমাদের এই গাইড, দুজনে মিলে আমাদের গাঁয়ে গিয়ে পাইপটা নিয়ে আয়। তোরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি আর হাক এই সিনাই পর্বতে অপেক্ষা করবো। তাঁবু খাটিয়ে থাকবো এখানে।'

জিম নৈরাশ্যের স্বরে বললো, 'আমি আর গাইড কোনো দিনও আমাদের গাঁখানা খুঁজে পাব না। তবে হ্যাঁ, গাঁয়ে পৌছোলে আমি পাইপটা খুঁজে পেতে পারি, কেন না আমি আমাদের রান্নাঘর চিনি। দুঃখের বিষয়, আমাদের গাঁ কিংবা সেণ্ট লুই শহর, কিংবা তার কাছাকাছি কোনো জায়গা আমি খুঁজে পাব না। কারণ, আমরা সেখানে যাওয়ার পথটাই চিনি নে।'

জিম খুবই সত্যিকথা বলেছে। মিনিট খানেক বোবা হয়ে থেকে টম বলে উঠলো, 'আমার কাছে এগিয়ে আয়। কিভাবে সেখানে যাবি, বলে দিচ্ছি।' কম্পাস দেখে সোজা পশ্চিমদিকে উড়ে যাবি। তাহলেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

দেখতে পাবি। সেখানে যাওয়াটা মোটেই কঠিন না। কেন না, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারেই সেই দেশটা। প্রথম দেশ। যদি দিনের বেলায় সেখানে পৌঁছোস, ফ্লোরিডা উপকূলের ওপরের অংশ থেকে সোজা পশ্চিমে চলে যাবি। তাহলে পৌনে দুঘণ্টার মধ্যে মিসিসিপি নদীর মুখে গিয়ে পৌঁছতে পারবি। মিসিসিপিকে চিনতে কষ্ট হওয়ার কথা না। একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে মিসিসিপিকে অনুসরণ করে যাবি। তারপর দেখতে পাবি ওহিওকে আসতে। এবার চোখদুটো আরো খুলে ধরবি। কারণ তোরা এসময় আমাদের গাঁয়ের কাছাকাছি এসে যাবি। বাঁদিকে দূরে আরেকটা সুতোকে আসতে দেখবি। এটাই হচ্ছে মিসৌরী নদী। এরই একটু ওপরে সেণ্ট লুই শহর। এ-সময় নীচে নেমে আসবি। গাঁগুলো চেনার চেষ্টা করবি। এর পরের পনেরো মিনিটে প্রায় পঁচিশটা গাঁ তোদের পার হতে হবে। তারপর দেখতে পাবি আমাদের গাঁখানা। আশাকরি এখন তোদের যেতে অসুবিধে হবে না। এর পরেও যদি কোনো জায়গায় খটকা থাকে, আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারিস।'

জিম বললো, 'এখন আর খটকার কিছু দেখছি নে। মাস্টার টম, এবার আমরা যেতে পারবো। ওর চোখেমুখে ফুটে উঠলো দৃঢ়তার ছাপ।

পথপ্রদর্শক অর্থাৎ গাইড বললো, 'একটু শিখে নিলে আমিও বেলুনটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

টম বললো, 'জিম তোমাকে আধঘণ্টার মধ্যেই শিখিয়ে দিতে পারবে। বেলুনটা চালানো একটা ডোঙা চালানের মতনই সোজা ব্যাপার।'

নকশা বের করে টম মাপজোপ সুরু করলো। তারপর পথটাকে দাগিয়ে দিল। এসময় ও মন্তব্য করলো: পশ্চিমদিক দিয়ে গেলে পথের দূরত্ব হবে মোটে সাতহাজার মাইল। কিন্তু পুবদিক দিয়ে গেলে সেটা বেড়ে দ্বিগুণ হবে। এরপর গাইডের দিকে ফিরে ও ফের বললো, 'তোমরা দুজনেই টেল-টেলের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখবে। যখন দেখবে যন্ত্রটার কাঁটা ঘণ্টায় তিনশো মাইল ছুঁচ্ছে না, তোমরা ওপরে উঠে যাবে, কিংবা নীচে নামবে, যতক্ষণ না কোনো অনুকূল ঝড়ের সাহায্য পাও। কোনো ঝড় বা বাতাসের সাহায্য ছাড়াই তোমরা ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে বেলুনটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। খুঁজলেই ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগের ঝড় যে-কোনো সময় পাবে।'

'আমরা নিশ্চয়ই খুঁজবো, স্যর।' বললো গাইড।

'নিশ্চয়ই খুঁজবে। সময় বিশেষে তোমাদের দু-মাইল ওপরে উঠতে হতে পারে। কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তবে বেশির ভাগ সময়ে তার অনেক নীচেতেই

তোমরা ঝড়ের দেখা পাবে। কোনো সাইক্লোনের সাথে তোমাদের যদি একবার মোলাকাৎ হয়, সেটা হবে একটা ভাগ্যের ব্যাপার! প্রফেসরের বইতে দেখতে পাবে, এসব অক্ষরেখায় সাইক্লোন পশ্চিমদিকে বয়।' এরপর সময় হিসেব করে টম আবার বললো, 'সাতহাজার মাইল। ঘণ্টায় ধর তিনশো মাইল। এই হিসেবে তোমরা একদিনে, তার মানে চব্বিশ ঘণ্টায় পথটা পাড়ি দিতে পারবে। আজ বিষ্যুদবার। তোমরা শনিবার বিকেল নাগাদ এখানে ফিরে আসতে পারবে। যাও, হাত লাগাও। আমার আর হাকের জন্যে কিছু খাবার, কম্বল, বই আর দরকারি জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে দাও। তারপর তোমরা রওনা হয়ে পড়। পাইপটা আমার চাই-ই চাই। যত তাড়াতাড়ি আনতে পার, ততই ভাল।'

আমরা সবাই বেলুন থেকে দরকারি জিনিসগুলো নামানোর জন্যে হাত লাগালাম। এতে আটমিনিট মতন সময় লাগলো।

বেলুনটা এবার আমেরিকা রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো। আমি আর হাক ফিন করমর্দন করে বিদায় জানালাম ওদের দুজনকে।

টম শেষ আদেশ দিল, 'এখন সিনাই পর্বতের স্থানীয় সময় হচ্ছে দুটো বাজতে দশ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমরা আমাদের দেশের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোবে। তখন আমাদের গাঁয়ের ঘড়িতে বাজবে সকাল ছটা। গাঁয়ে পৌঁছে পাহাড়টার চুড়োর একটু পেছনে জঙ্গলের ভেতর নামবে। তাহলে তোমাদের কেউ দেখতে পাবে না।' একটু থেমে জিমের দিকে তাকিয়ে টম আবার বললো, 'জিম, তুই যখন পাহাড়ের নীচে নেমে গিয়ে এই চিঠিগুলো পোস্টে-অফিসে চালান দিবি, সে-সময় যদি দেখিস কেউ তোর দিকে তাকাচ্ছে, মুখটা নীচু করে ফেলবি, যাতে তোকে সে চিনতে না পারে। তারপর তুই বাড়িতে গিয়ে পেছন দিক দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকবি। পাইপটা নিয়ে এই চিঠিটা রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রাখবি। যাতে চিঠিটা উড়ে না যায়, সে-জন্যে কিছু একটা দিয়ে এটা চাপা দিবি। তারপর চুপিচুপি বেরিয়ে আসবি সেখান থেকে। সাবধান, পলি মাসি বা অন্য কেউ যেন তোকে দেখে না ফেলে। এর পরেই পাহাড়ের পেছনে এসে বেলুনে উঠে পড়বি। ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে এটাকে সিনাই পাহাড়ের দিকে চালিয়ে দিবি। মনে থাকে যেন, একঘণ্টার বেশি সময় সেখানে খরচ করা চলবে না। গাঁয়ের ঘড়িতে যখন সকাল সাতটা বা আটটা বাজবে, তখন তোরা রওনা দিবি। তাহলে তার চব্বিশ ঘণ্টা পরে তোরা এখানে পৌঁছে যাবি। এই সিনাই পাহাড়ের ঘড়িতে যখন বিকেল দুটো বা তিনটে বাজবে, তখন তোরা এখানে এসে নেমে পড়বি।

ব্যস।'

টম ওর মাসিকে যে-চিঠিটা লিখেছিল, সেটা আমাদের পড়ে শোনালো। ও লিখেছিল—

বিষ্যুদবারের বিকেল।

আকাশচারী টম সয়্যার সিনাই পর্বত থেকে তার ভালোবাসা পাঠাচ্ছে পলি মাসিকে। আর্ক-[আকাশযান]-টা [১] এখানেই আছে।—আকাশচারী টম সয়্যার।

মাসি এই চিঠিখানি পাবেন আসছে কাল সকাল সাড়ে ছটায়।

টম ফের বললো, 'চিঠিটা পড়লেই মাসির চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে যাবে। চোখে জলও আসবে উপচে।' একটু থেমে ও আবার বললো, 'স্ট্যাণ্ড বাই! ওয়ান—টু—থ্রি—উড়ে যাও।'

বেলুনটা সঙ্গে সঙ্গে উড়তে আরম্ভ করলো। এক নিমেষের মধ্যেই সেটা চলে গেল চোখের আড়ালে!

এরপর আমরা একটা মনের মতন গুহা খুঁজে নিলাম। পাইপটার জন্যে এখানেই আমরা অপেক্ষা করে থাকবো।

বেলুনটা ঠিক সময়ে ফিরে এলো। পাইপটাও এসে গেল। সেই সাথে এলো একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ!

জিম যখন ওদের রান্নাঘরে ঢুকে পাইপটা নিচ্ছিল, পলি মাসি তখন ওকে খপ করে ধরে ফেলেন। এর পরে কী ঘটেছিল, তা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে নেই। তিনি কড়া স্বরে টমকে সাথে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে আদেশ করেছেন জিমকে!

জিম বললো, 'মাস্টার টম, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। যতক্ষণ না তোমাকে তিনি ফিরে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি সেখান থেকে নড়বেন না। কাজেই ভীষণ ঝামেলা বেধে গেছে! ভীষণ ঝামেলা!'

অতএব আমরা মহাদুঃখে বাড়ির পথেই রওনা হলাম। বলাই বাহুল্য, ফেরার পথে আমাদের মনে কোনো আনন্দ নেই!

---

১ আর্ক-[Ark]-এর ভুল ব্যবহার সম্ভবত হাক করেছে, টম নয়।—মার্ক টোয়েন।

প্রলয় প্লাবনের সময় আর্ক [Ark] নামক জাহাজে থেকে সপরিবারে রক্ষা পেয়েছিলেন।—অনুবাদক।

[শেষ]